GOLDEN JUBLIEE SOUVENIR

Rabindra Mahavidyalaya

Champadanga, Hooghly

পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত রাসায়নিক সার ও বীজ বিক্রেতা
আলু, পাট ও পাঞ্জাব বীজের কমিশন এজেণ্ট
প্রো. অশোক কুমার ধাড়া
চাঁপাডাঙ্গা (কলেজের নিকট) হুগলী
যোগাযোগ
9434402571 / 9733851426

সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

চাঁপাডাঙা, হুগলি

সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ
প্রকাশনা উপ-সমিতি ও সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্যাপন কমিটি দ্বারা প্রকাশিত

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
ড. প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য, অধ্যক্ষ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

মুখ্য পৃষ্ঠপোষক
মাননীয় শ্রী রামেন্দু সিংহরায়, সভাপতি, পরিচালন সমিতি

সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্যাপন কমিটির আহ্বায়ক
ইতি মুখার্জী
সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশনা উপ-সমিতি
সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
পম্পা মুখোপাধ্যায়
চিরদীপ মজুমদার
বাসবী পাল
অমিত দাস
বাপী কিস্কু
অর্পন দে
দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য
অয়ন মুখোপাধ্যায়
বিনয় সাধুখাঁ
উত্তম ঘোড়ুই

©রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, ২০২৪

বর্ণশুদ্ধি, বর্ণসজ্জা ও প্রচ্ছদ
প্রয়াস

মুদ্রণ
নির্মলা প্রিন্টিং, চাঁপাডাঙা

একটি রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় প্রকাশনা

With best compliments:
CAMS

With best compliments:

Nayan Kundu

With best compliments:

Amit Dhank

Singur, Hooghly

Mob.- 9433260280 // W.- 8621872532

এস. এ. মার্বেল

হোলসেল এণ্ড রিটেল

Kajaria JOHNSON® Not just tiles, Lifestyles. Authorised Dealer

চাঁপাডাঙ্গা কলেজ রোড, বালিমাঠ, হুগলী

SYSTECH

3A, Mango Lane, 1st Floor, Kolkata - 700001
Mob: 94330 12030 Desk: 033 4848 8808

সূচিপত্র

শুভেচ্ছাবার্তা:

নিমাই চন্দ্র সাহা ১
অপরূপা পোদ্দার ২
সুজিত কুমার চৌধুরী ৩
মানস কুমার জানা ৪
প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য ৫
রামেন্দু সিংহ রায় ৬
আলহাজ সেখ মেহেবুব রহমান ৭
সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৮
তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ১০

বন্ধু রহো রহো সাথে ১১
ইতি মুখার্জি

(আ)সময়ের উদ্‌বৃত্ত অথবা
সুবর্ণ জয়ন্তী প্রসঙ্গে ১৩
সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আর্ধশতকে ফিরে দেখা:
একটি পর্যালোচনা ১৯৭১–২০২১ ২০
অভিজিৎ বাগ

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় স্থাপনার ইতিহাস ৪৫
অমরেন্দ্রনাথ আদক

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর ৫০
তরুণ কুমার মণ্ডল

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় কিছু স্মৃতিকথা ও সেখান থেকে বর্তমানে উত্তরণ ৫৫
সালাউদ্দীন খান

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সাবেকি কথা ৫৮
দেবপ্রসন্ন বিশ্বাস

ফিরে দেখা ৬২
সুকান্ত দাস

এভাবেও ফিরে আসা যায় ৬৩
পারভিন হোসেন

'স্মৃতি' ?— *অপরাজিতা প্রসঙ্গে* ৬৭
প্রিয়া প্রামাণিক

সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের চূড়ান্ত পর্বের অনুষ্ঠানসূচি ৬৯

Prof. (Dr.) Nimai Chandra Saha
Vice Chancellor

The University of Burdwan
Rajbati, Burdwan-713104
Ph. 0342-2634900, Fax : 0342-2530452
Mob : +919051342474
e-mail : vc@buruniv.ac.in, vcbunsaha@gmail.com

No. V/M-4/33

Dated 18th October, 2022

MESSAGE

I convey my warm wishes to the Teachers, Students, Alumni and all the stakeholders of Rabindra Mahavidyalaya, Champadanga, Hooghly for completing its 50 years of glorious journey in the year 2021.

It is also pleasing to know that during the celebration of this glorious event on 8-11 November, 2022, various cultural programmes will be organized by the College authority.

It is also pleasing to know that a souvenir will also be published in this occasion.

I wish the event as well as the publication of the souvenir a grand success.

18.10.22

Nimai Chandra Saha
Vice Chancellor

Dr. Prasanta Bhattacharyya
Principal, Rabindra Mahavidyalaya
Champadanga, Hooghly-712401, W.B.

APARUPA PODDAR
Member of Parliament
(Lok Sabha)

Member:
- Standing Committee on Water Resources
- Consultative committee for the Ministry of Tourism and Culture

सत्यमेव जयते

Residence Address :
28, Gandhi Sarak, P.O. Rishra
Dist. Hooghly, Pin-712248
Telefax: 033-26720411

Delhi Address :
208, North Avenue
New Delhi-110001
Telefax : 011-23094616
Mobile : 09013869786

Date - 15/10/22

-ঃ শুভেচ্ছা বার্তা ঃ-

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ন জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলাম । সুদীর্ঘকাল হইতে এই মহাবিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রীদের পঠনপাঠনের সুব্যবস্থা করিয়া সুনামের সঙ্গে ইহার কার্যকাল অতিবাহিত করিতেছে । আমি উক্ত মহাবিদ্যালয়ের সাফল্য কামনা করি । এছাড়া এই সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে কলেজ কতৃপক্ষ যে সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছে তাহা জানিয়াও উৎফুল্ল হইলাম । এই মহা বিদ্যালয় বরাবরই আমার পছন্দের একটি মহাবিদ্যালয় । মহাবিদ্যালয়ের এই উদ্যমকে আমি সাধুবাদ জানাইতেছি ।ভবিষ্যতে এই মহাবিদ্যালয় শিক্ষার পিঠস্থানে পরিনত হউক এই কামনা করি ।

ধন্যবাদান্তে

APARUPA PODDAR
MEMBER OF PARLIAMENT
LOK SABHA

Dr. Sujit Kumar Chowdhury
REGISTRAR

THE UNIVERSITY OF BURDWAN
RAJBATI, BURDWAN-713104
WEST BENGAL, INDIA.

Dated, October 14, 2022

Message

I feel extremely happy to learn that Rabindra Mahavidyalaya, Champadanga, Hooghly under the University of Burdwan, is going to organize different cultural programmes on the occasion of Golden Jubilee will be held on and from 8th to 11th November, 2022.

I appreciate and encourage their great effort and I am confident the different cultural programmes will prove more useful to the teachers, students and well wishers.

I wish this endeavour a grand success.

Registrar
REGISTRAR
THE UNIVERSITY OF BURDWAN
BURDWAN-713104

Ph: 0342-2530300(O), 2530526(R), EPABX 0342-2634975 Ext 211(O), 267(R)

Prof. Dr. MANAS KUMAR JANA

Ex- Principal
Rabindra Mahavidyalaya
Champadanga

message

It gives me an immense pleasures that Rabindra Mahavidyalaya, Champadanga, a premier educational institution has completed its 50 years and is celebrating its Golden Jubilee year. To commemorate the occasion the college is bringing out its Golden Jubilee Souvenir.

Rabindra Mahavidyalaya, Champadanga has been playing an important role in imparting education especially in Rural and Semi Urban areas since the year 1971. It has been making a significant contribution in educating the student as well as awakening them against the social evils. It has also been playing a stellar role in rejuvenating the society – academically, intellectually and socially.

While celebrating its Golden Jubilee year, the college is proud of its achievements that brought laurels for this institution. It has produced lots many academician, administrative officials, politicians, scientists, sportsmen and a man of repute by which society may feel proud of it. It has proved its worth in every sphere of life.

I hope that Golden Jubilee year celebration world elevate the hope and spirits of teachers, students and management and inspire them to achieve for excellence in the overall performance of the college.

I congratulate the management, staff and students of the college on the Golden Jubilee and wish them a bright future. I also convey my best wishes for the successful publication of the "Rabindra Mahavidyalaya Subarna Jayanti Smarak Grantha" which would highlight its achievement of the college achieved during the period of 50 years.

Dr. Manas Kumar Jana

RABINDRA MAHAVIDYALAYA

Affiliated to The University of Burdwan
CHAMPADANGA, HOOGHLY,
PIN-712401 **Estd. -1971**
NAAC (Cycle-2) Accredited B++ Institution

পঞ্চাশতম বছরে পদার্পণ করল মহাবিদ্যালয়। অনেক উচ্চাবচ সময়ের সরণি পেরিয়ে এই মাইলফলক ছোঁওয়া। আয়োজন এই পথচলার পাঁচালি লিপিবদ্ধ করার সুবর্ণজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থে। স্মৃতির ঘোষণা ফিরে দেখার কথা বলে। কাব্যিক তর্পণের মুহূর্ত তৈরি হয়। আমরা স্তব্ধ হই আর অনুচ্চারিত আবেগের অঙ্গীকার আমাদের যূথবদ্ধ করে। অনেক পেয়েছি আবার হারিয়েছি অনেক কিছুই। জীবনধর্মের প্রত্যেকটি দাগ ফুটে আছে চোখের সামনে, যখন পেছনপানে দৃষ্টিপাতের সুযোগ আসে। আশ্বস্তও লাগে এই চলিষ্ণুতার সঙ্গী হতে পেরে। অনেক ছবি আর শব্দের ক্যানভাস আলো করে রাখে পঠনপাঠনের এই সবুজ কেন্দ্রটিকে আর ভবিষ্যতের রূপরেখার এক মানচিত্র তৈরি হয় মনে এবং মননে। সংকট আর সুযোগের দোলাচল ভবিষ্যতের নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সুযোগ করে দেয়।

সামগ্রিক সৌহার্দ্য এবং সহযোগিতা না থাকলে এতটা পথ পেরোনো পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের সমান মনে হয়। সুতরাং অগণিত ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক আর শুভানুধ্যায়ীদের কথা মনে করি, যাদের জানা-অজানা ভূমিকা ছাড়া এই যাত্রা সম্ভবপর ছিল না। পুরোনো সহকর্মী যাঁরা তাঁদের যত্ন দিয়ে গড়ে তুলেছেন এই সার্বিক অস্তিত্ব, তাঁদের স্মরণ করার সুযোগ এই কালপঞ্জি লিপিবদ্ধ হওয়ার ব্রাহ্ম মুহূর্তে। বর্তমানে যাঁরা সর্বতোভাবে আমাদের সাহায্য করে চলেছেন সেইসব এলাকাবাসী মানুষ, প্রশাসনিক কাজে যুক্ত পদাধিকারীগণ, ব্যবসায়ী সকলকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই আমাদের চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ করে তোলার জন্য। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. নিমাই চন্দ্র সাহা শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়ে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। পরিচালন সমিতির মাননীয় সভাপতি ও তারকেশ্বরের বিধায়ক শ্রী রামেন্দু সিংহরায় আমাদের এই সুবর্ণজয়ন্তীর প্রচেষ্টাকে সফল রূপদান করেছেন বলে মহাবিদ্যালয়ের তরফে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়াও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক ড. সুজিত কুমার চৌধুরী, তৎকালীন সাংসদ মাননীয়া অপরূপা পোদ্দার, হুগলি জিলা পরিষদের সভাপতি আলহাজ শেখ মেহেবুব রহমান, পরিচালন সমিতির অপরাপর সদস্যরাও আমাদের ধন্যবাদার্হ, তাঁদের মূল্যবান, সময়োপযোগী মতামত দানের জন্য। পূর্বতন অধ্যক্ষ ড. তরুণ কুমার মণ্ডল এবং ড. মানস কুমার জানা তাঁদের শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়ে এবং লেখনী দিয়ে আমাদের সমৃদ্ধ করেছেন। ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে থাকা ছাত্র ইউনিয়নের সদস্যদের গঠনমূলক ভূমিকা যেমন অনস্বীকার্য তেমনি আমার বর্তমানের ছাত্রছাত্রীদের কথা বলাই বাহুল্য। সকল শিক্ষক আর শিক্ষাসহায়ক সহকর্মীদের অকুণ্ঠ, অনাবিল আর অফুরান সাহায্য ছাড়া এই বিরাট কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হত না। এই সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যাটি তারই স্মারকচিহ্ন হয়ে থাক এই কামনা। আগামীতে আমাদের গমন সুস্থ-সুন্দর হোক সকলের সমবেত প্রয়াসে, এটুকুই অভিপ্রায়।

অধ্যক্ষ
রবীন্দ্র মহাবিদ্যা

RAMENDU SINHARAY
Member,
West Bengal Legislative Assembly

Vill. : Dakshin Kotalpur
P.O. : Kumrul
P.S. : Dhaniakhali
Dist. : Hooghly
Pin. : 712410
M. : 9475163411
9933465181
e-mail : ramendusingharay@gmail.com

Date 16/10/2022

শুভেচ্ছা বার্তা

আজ যা বর্তমান কাল সেটাই অতীত, এই বর্তমান-অতীত করতে করতে চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় ৫০তম বর্ষে পদার্পণ করলো আগামী ৮ই নভেম্বর ২০২২ হইতে ১১ই নভেম্বর ২০২২ রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ পালন হবে শুনে খুব আনন্দ পেলাম।

উক্ত অনুষ্ঠানে মহাবিদ্যালয় আঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠুক, নবীন-প্রবীন ছাত্র-ছাত্রীদের মেলবন্ধন এবং সকলের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন মহাবিদ্যালয়ের আগামীর চলার পথ প্রশস্ত করবে এই আশা রেখে রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে শেষ করলাম।

ধন্যবাদান্তে

Ramendu Sinharay

আলহাজ সেখ মেহেবুব রহমান
সভাধিপতি
হুগলী জিলা পরিষদ

কার্য্যালয় ঃ
পোঃ- চুঁচুড়া
জেলা ঃ হুগলী, পিন-৭১২১০১
দূরভাষ ঃ ২৬৮০-১০৮৯
২৬৮০-৪২১৪
২৬৮০-৪২১৫

বাসস্থান ঃ
গ্রাম ও পোঃ- বৈকুন্ঠপুর
থানা- পুরশুড়া, জেলা- হুগলী
পিন- ৭১২৪১৪
দূরভাষ ঃ ৯৮৩৬০৯৯০৩২
E-mail : sdphzp@gmail.com

ডি. ও. নং ৩৭/এস.ডি.পি/হু.জি.প.   তারিখ ২৮.১০.2022

শুভেচ্ছা বার্তা

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙ্গা, হুগলী আগামী ০৮ থেকে ১১ই নভেম্বর'২০২২ বিভিন্ন অনুষ্ঠান কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে **"সুবর্ণ জয়ন্তী"** বর্ষ উদযাপন করতে চলেছে জেনে খুবই আনন্দিত হলাম।

সেই সঙ্গে উদযাপন কমিটি একটি **"স্মরণিকা"** প্রকাশ করছে শুনে খুশি হলাম।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে স্মরণিকা সহ সমগ্র অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করি এবং মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, সকল অধ্যাপক/অধ্যাপিকাসহ উদযাপন কমিটির সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

(আলহাজ সেখ মেহেবুব রহমান)

অধ্যক্ষ,
রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়,
চাঁপাডাঙ্গা, হুগলী।

শুভেচ্ছা বার্তা

আমি সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা হিসেবে যোগদান করি ১৯৯৯-এর মাঝামাঝি, বর্ষাকাল। চতুর্দিক সবুজ সবুজ। প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে। বাবা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন কলেজ জয়েন করাতে। পরিবেশ দেখে আমি তো মুগ্ধ, মুগ্ধ সরকারি কাজের সূত্রে বিভিন্ন জেলায়, ওই সব জেলার গ্রামগঞ্জের হালহদিশ জানা আমার অভিজ্ঞ বাবাও। কিন্তু বাড়ি থেকে এতদূর, মন খারাপ লাগবে তো ভীষণ। আমার রন্ধনপটীয়সী মা প্রচুর টিফিন দিতেন সঙ্গে, একা খেয়ে শেষ করা যেত না।

কলেজে এসে পেলাম বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ। অধ্যাপক উপানন্দ রায় তখন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। অগ্রজদের স্নেহ পেলাম, প্রদীপদা, অর্ধেন্দুদা (ইতিহাস বিভাগ) সস্নেহে বোঝালেন কোন ক্লাসে কী পড়াতে হবে—অভিজ্ঞতা ছিল আগের একবছর জে আর এফ পাওয়ার সূত্রে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু ক্লাস নেওয়ার। পেলাম প্রিয় অধ্যাপিকা দিদিদের—সুমিতাদি, দুই রমাদি, ইতিদিকে।

প্রথমদিন ক্লাসে গিয়ে মুগ্ধ—কালো বোর্ডে সাদা চক দিয়ে নিঁখুতভাবে গ্রামীণ দৃশ্য এঁকেছে এক ছাত্র। সেইদিনই এইসব ছেলেমেয়েদের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসায় আপ্লুত হয়ে গেলাম। ওদের চাইতে বছর সাতেকের বড়ো আমি খুব দ্রুত ওদের কাছাকাছি চলে এলাম, সে বন্ধন অটুট বন্ধন হয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে আজও।

সিনিয়র তন্ময়দার স্নেহ, ভ্রাতৃপ্রতিম বর্তমান অধ্যক্ষ ড. প্রশান্ত ভট্টাচার্যের পরামর্শ ও উপদেশ পাথেয় করে এগিয়ে গিয়েছি, পেয়েছি জুনিয়রদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

চড়াই-উতরাই পেরিয়ে কেটে গেল তেইশটা বছর। ১৯৯৯-এর আমি আর ২০২২-এর আমি আকাশ-পাতাল ফারাক। তবুও সবই কি অচেনা? তা বোধহয় নয়। মানুষটা তো একটাই। সব দোষগুণ নিয়ে সেই একজনই।

এ কলেজ দেখেছে অনেক রাতদখল, গায়ে মেখেছে তার আঁচ, আগুনের আঁচে পুড়ে হয়েছে শুদ্ধ। কেউ কখনও গলা টিপে মারতে পারেনি এর প্রাণশক্তিকে, এর কোলে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েরা আজও

সেরকমই ছবি আঁকে, তেমনই নাচে, আবৃত্তি করে, তেমনই গান গায়। ইউজিসি পরিদর্শনে আগত বিশিষ্ট অধ্যাপিকা ২০১৭-তে বলেছিলেন, এই কলেজের কোকিলকণ্ঠী ছাত্রীদের কণ্ঠসুধা এর অনাবিল নিসর্গের মতোই সুন্দর।

কলেজ পদার্পণ করল সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে। আমরা এই সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে চাই। আমরা চাই আমাদের প্রিয় রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সুনাম ছড়িয়ে পড়ুক দিকে দিকে।

সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ
আহ্বায়ক, সুবর্ণ জয়ন্তী শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি
প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা

শুভেচ্ছা বার্তা

আমি, তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে বিগত পঁচিশ বছর ধরে কমার্স বিভাগে শিক্ষকতা করছি। কলেজের এত বছরের ইতিহাস, তার যাত্রাপথ—সেই পথের বাধাবিপত্তি, তার এগিয়ে চলা, তার সম্ভাবনা, তার উৎকর্ষ, অপকর্ষ খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এতগুলো বছর একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো মানুষ যুক্ত থাকে তাহলে তার প্রতিটি ইট-কাঠ-পাথর স্বভাবতই ওই ব্যক্তির খুব চেনা হয়ে যায়, খুব আপন হয়ে যায়, মানুষের কথা তো আলাদা করে বলার কিছু নেই, এই কলেজ আমার বৃহত্তর পরিবার, অধ্যক্ষ বিদ্যাবুদ্ধিতে আমার অগ্রজ, বয়সে অনুজ, কলেজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে সকলকে সঙ্গে নিয়ে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন, শুভেচ্ছা ও আর্শীবাদ রইল তাঁর জন্য।

কলেজ ২০১৭-তে ইউজিসি মূল্যায়নে B++ মান অর্জন করেছে। এই ঘটনা আমাদের সমস্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফল।

এলাকার উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে এই কলেজ আশপাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার মহান ব্রত নিয়ে এগিয়ে চলুক এই কামনা রইল। পড়াশোনার পাশাপাশি আমাদের ছেলেমেয়েরা ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে। কোভিড পর্বে আমরা অনেকগুলি আন্তর্জালিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যাচর্চার বিষয়টি অব্যাহত রাখতে পেরেছি। সকলকে সাথে নিয়ে এগিয়ে চলুক কলেজ পরিবার।

তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
আইকিউএসি কোঅর্ডিনেটর।

বন্ধু রহো রহো সাথে

তোমার জন্মলগ্নে আমি ছিলাম না, তোমায় আমায় দেখা হল ১৯৮৬ সালের ৫নভেম্বরে। ১৯৭১ সালের শিশু অবস্থা থেকে তখন তুমি শৈশব আর কৈশোরের সন্ধিক্ষণে, আমি মুগ্ধ হলাম তোমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, মুগ্ধ হলাম শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও কচিকাঁচাদের সহাবস্থানে তোমাকে প্রাণের জোয়ারে ভাসতে দেখে। শুনলাম তোমার জন্মলগ্নের কথা। এলাকায় বিশিষ্ট জন ও অধিবাসীর ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাহায্যে তোমার পথচলার সূচনা হয়েছিল। তখন তোমার যাত্রাপথ একেবারেই মসৃণ ছিল না। অনেক প্রতিবন্ধকতা, চড়াই উতরাইয়ের মধ্যে দিয়ে তোমার পথচলা শুরু হয়েছিল। কিন্তু সমস্ত সমস্যাকে সাথে নিয়েই তুমি তোমার জয়যাত্রার পথে এগিয়ে গিয়েছ, সঙ্গে থেকেছেন এলাকার সহৃদয় ব্যক্তি, অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ও তোমার ছাত্র-ছাত্রী। তখন তোমার-আমার অভিভাবক ছিলেন অধ্যক্ষ চন্ডীদাস মুখার্জি মহাশয়। তিনি আমাদের সকলকে নিয়ে এগিয়েছেন অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে, তাঁকে সাহায্য করেছে তৎকালীন সরকারি ব্যবস্থাপনা। তুমি আরও সমৃদ্ধ হয়েছ।

তোমার শুরু হয়েছিল শুধু বাণিজ্য শাখা নিয়ে। পরবর্তীতে আরও বিভিন্ন বিষয় যেমন— বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, শারীরশিক্ষা ও শিক্ষাবিদ্যা ইত্যাদিতে তোমার কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে। এসেছে সমস্ত বিষয়ের অনার্স, তোমার বিজয়যাত্রা এগিয়ে গেছে। তুমি কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করেছ। তোমার আঙিনা ফুলে ফলে ভরে উঠেছে নতুন নতুন শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের আগমনে। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ভালো ফল তোমাকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট জায়গা দিয়েছে। মনে পড়ে সেইসব শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যাঁরা অবসর নিয়ে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন, আর যাঁরা তোমার কাছে প্রশিক্ষিত হয়ে উচ্চতর জায়গায় অন্যত্র গিয়ে তোমার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু ব্যথা দিয়েছে অকালে চলে যাওয়া বেশ কিছু শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্র— যাঁদের আজও আমরা ভুলতে পারিনি। তাঁদের চলে যাওয়া তোমাকে ব্যথিত করেছে, আমাদের কাঁদিয়েছ।

অতীত থেকে এখন বর্তমানে আসি। অধ্যক্ষ চণ্ডীদাস মুখার্জি মহাশয় পরেড. তরুণ মণ্ডল মহাশয় ড. মানস কুমার জানা অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। মাঝে কিছু অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা তোমার দায়িত্বে ছিলেন। অধ্যাপিকা সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ার সময়ে তুমি NACC-এ B++ অর্জন করেছ। আমরা গর্বিত হয়েছি। বর্তমানে তুমি অধ্যক্ষ ড. প্রশান্ত ভট্টাচার্য মহাশয়ের অভিভাবকত্বে সুবর্ণ জয়ন্তী পদার্পণ

করেছ। ২০২১ সাল তোমার সুবর্ণ জয়ন্তী বছর হলেও বিশ্বময় কোভিড ১৯-এর অতিমারি আমাদের এই সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনে অন্তরায় ছিল। তাই ২০২২ সাল ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে তোমাকে আবার আরও সুন্দর, উজ্জ্বল করে তুলতে চাই। তোমাকে আবার নবআনন্দে জেগে ওঠা দেখতে চাই।

আমাদের পরিকল্পনা তে আছে বিভিন্ন বিষয়ের সেমিনার (যার বেশ কিছু ইতিমধ্যে করা হয়েছে) রক্তদান শিবির, কলেজের ক্যানটিন সংস্কার, ঔষধিবাগান, সবুজায়ন, বৃক্ষরোপণ, ছাত্র-ছাত্রীদের পানীয় জলের ব্যবস্থা উন্নত করা, পঠন-পাঠনের পরিবেশ সুচারুভাবে গড়ে তোলা ইত্যাদি। এর জন্য সর্বোপরি আমাদের দরকার এলাকায় অধিবাসীদের সাহায্যে আমাদের হাত শক্ত করা, পরিচালন মণ্ডলীর সাহায্য, অধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও সাহচর্য। এক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। ছাত্রছাত্রীরাই আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, তোমার ভীত শক্ত করতে তারাই সক্ষম। তোমাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলার চাবিকাঠি তাদের হাতে, তারাই এই দায়িত্ব পালন করতে পারে। তারা তাদের মেধা, শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা দিয়ে তোমাকে সুন্দরতম করে তুলতে পারে। এই কাজে তারা তাদের শিক্ষকদের সর্বদা সাথে পাবে।

সুবর্ণ জয়ন্তী বছরে আবার তোমাকে 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন'-এ আসীন দেখতে চাই। আমাদের সকলের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় আমরা অবশ্যই তোমাকে সেই আসন দিতে পারব এই আশা নিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মেলবন্ধন করলাম।

তুমি আমাদের গর্ব।

ইতি মুখার্জি
অধ্যাপিকা, অর্থনীতি বিভাগ
আহ্বায়ক, সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি

(অ)সময়ের উদ্‌বৃত্ত অথবা সুবর্ণ জয়ন্তী প্রসঙ্গে

দিনাবসানের হিসেবে আমাদের কলেজ, হুগলির চাঁপাডাঙা অঞ্চলের রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, ২০২১ সালের ৮ নভেম্বর তারিখে যখন পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করল, এই কলেজে আমার চাকরির মেয়াদকাল পাঁচ বছর পূর্ণ হতে আরও মাস পাঁচেক বাকি। এখন পাঁচ আর পঞ্চাশের মধ্যে যেহেতু শূন্য ব্যতিরেকে ফারাক নেই কোনো, খানিক বাড়িয়ে-চাড়িয়ে একটা আবেগঘন স্মৃতিরম্য কথা, চাইলে কি আর রচনা করে ফেলা যেত না! কিন্তু আবার যেহেতু পাঁচ আর পঞ্চাশের মধ্যে রয়েছে একটা শূন্যের ফারাক, কাজেই উপস্থিত ওই শূন্যেই হয়তো মিলিয়ে যেত আমার বানিয়ে তোলা সব কথার বুদ্‌বুদ। অতএব খানিক সচেতনতার সঙ্গে এই লেখায় ও-পথ এড়িয়ে গেলাম।

ঠিক স্মৃতিসূত্রে না-হলেও অতীত প্রসঙ্গ খানিক টেনে এনেই কথা শুরু করা যাক। ২০১৭ সালে আমি যখন এই কলেজে আমার অধ্যাপনা জীবনের প্রথম পাকা চাকরিটা পেয়ে আসি, রাজ্যে তখন পরিবর্তিত রাজনৈতিক ক্ষমতা সরকার পরিচালনার প্রথম দফা/পর্ব শেষ করে দ্বিতীয় দফায়/পর্বে থিতু হতে শুরু করেছে। প্রায় দীর্ঘ দশ বছর ধরে এ-রাজ্যে জারি থাকা মারাত্মক রকমের রাজনৈতিক হিংসা এবং সন্ত্রাসের তখন বেলা খানিক পড়তির দিকে। চাঁপাডাঙা কলেজ এবং এলাকা সম্পর্কে যেহেতু আমার কোনো পূর্বজ্ঞান ছিল না, সাহায্য নিই গুগলের। এবং সেখানে প্রথমেই উঠে আসা কোনো এক টিভি চ্যানেলের ইউটিউব ভিডিয়ো খুলে দেখি, ছাত্রদের কোনো একটা ঝামেলা সূত্রে কলেজে ব্যাপক বোমাবাজি চলছে। সেই সময়ের নিরিখে, পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে এ-রকম ঘটনা তেমন কিছু ব্যতিক্রমী যেহেতু ছিল না, অন্যান্য সুবিধার নিরিখে এই কলেজকেই চাকরিক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করতে খুব বেশি দ্বিধাগ্রস্ত হইনি আর। তবে কলেজে আসার পর অনেকের থেকে শুনেছিলাম ওই দশ বছরের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শরিক হিসেবে এই কলেজে ঘটে যাওয়া নানান রোমাঞ্চকর কাহিনি। যদিও নিজে চোখে সেইসব ঘটনার ছিটেফোঁটারও দেখা আমি আর পাইনি এখানে। শেষ বোমাটা অবধি পড়েছিল আমি জয়েন করার কয়েকদিন আগে। তারপর থেকে আপাতত সব শান্তিকল্যাণ হয়ে আছে।

যাতায়াতে সময় অপচয়ের কথা ভেবে আমি যেহেতু এই অঞ্চলেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে আলাপসূত্রে প্রায়ই শুনতে পেতাম কলেজের রাজনৈতিক হিংসার নানান কিস্‌সা। আর শুনতে পেতাম ওই সময়পর্বের আগের কলেজ সম্পর্কিত নানান প্রশংসা, এমনকি রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে ছেলেমেয়েদের আর এই কলেজমুখো করতে না-চাওয়া জনিত আক্ষেপও! শোনা ছাড়া তখন আর তেমন কোনো কিছু করারও ছিল না আমার। এলাকা অথবা কলেজ সম্পর্কে নিজে তো আগে থেকে জানতাম না কিছুই। তাছাড়া, সন্ত্রাসের একটা নীরব উপস্থিতি, তখনও ওখানকার আবহাওয়ায় মিশে ছিল যেন; চাইলেই উপলব্ধির আওতাভুক্ত করা যেত!

এসব কথা লিখছি আসলে এটাই বোঝাতে, কলেজের সঙ্গে পরিচয় গড়ে ওঠার প্রাথমিকপর্বেই আমি মোটামুটিভাবে এই ধারণাতে উপনীত হয়েছিলাম যে, এই কলেজের তথাকথিত বসন্তকাল আপাতত ঘুচেছে। কথাটা অবশ্য খুব আলাদা কিছু ছিল না। নানান সূত্রে অন্যান্য অনেক স্কুল-কলেজ সম্পর্কে এমনই সব কথা তখন চারদিক থেকে কান না পাতলেও কানে চলে আসার অবস্থায় পৌঁছেছে। আর যাঁরা আরও বেশি জানেন এবং বোঝেন, তাঁরা সামগ্রিকভাবে রাজ্যের শিক্ষার দিকটাই যে বর্তমানে গোল্লায় গেছে, তেমন বলতেও দ্বিধাবোধ করছেন না মোটে! আমি অবশ্য শিক্ষা গোল্লায় যাওয়ার কথাটাও সেই ছোটোবেলা থেকেই শুনছি বলে, একে একটা রাজনৈতিক চাপানউতোরের বেশি কিছু ভাবব কি না, সেই নিয়ে খানিক ধন্দের মধ্যেই ছিলাম তখন। তাছাড়া বিষয়টাকে 'যা গেছে তা যাক' ভেবে ঝেড়ে ফেলা এক্ষেত্রে যেহেতু কর্মনৈতিক প্রশ্নে একেবারেই সম্ভব ছিল না, আরও অনেকের মতো আমিও নবনিযুক্তির বাড়তি উদ্যমে লেগে পড়ি গোল্লায় যাওয়ার বিপরীত টানটাকেই জোরদার করতে।

(২)

এরই মধ্যে আমাদের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ডামাডোলের অভিঘাত থেকে কলেজকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার প্রক্রিয়াকে সুদৃঢ় করে তুলল পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচন প্রক্রিয়া বাতিল করার সরকারি সিদ্ধান্ত। রাজনীতির গণতান্ত্রিক প্রশ্নে এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বিতর্ক যেমন সেদিনও যথেষ্ট স্বাভাবিক ছিল, তেমনই স্বাভাবিক ছিল এই সিদ্ধান্তের দরুন সেদিন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে দাঁড়িয়ে যাঁরা শিক্ষার প্রশ্নে খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, তাঁদের সেই উপলব্ধিও। 'বোম পড়া কলেজ'-এর তকমা আগামীতে তাহলে ঘুচলেও ঘুচতে পারে, এমন এক প্রত্যয় ক্রমশ দৃঢ় হয়ে উঠতে শুরু করল আমাদের অনেকের মধ্যেই।

বোমের যে কত ধরন, এবং যুগে যুগে তার কত যে রূপান্তর ঘটেছে, সে বিবর্তনের ইতিহাস যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে দেখার বিষয় হলেও, এখানে সেই অবকাশ আপাতত নেই। কিন্তু আর মাত্র বছর দেড়েকের মধ্যেই কোভিডের যে বোমাটি ফাটল, তা গোটা বিশ্বের কিনা জানি না, অন্তত আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের কাঠামোটার ভিতটাকেই যে কাঁপিয়ে দিল, তা নিয়ে আজ আর কোনো সংশয় আমাদের কারোর মধ্যেই আছে বলে তো মনে হয় না। কোভিডের কারণে ২০২০ সালের মার্চের মাঝামাঝি সময়ে (সম্ভবত ১৫ মার্চ থেকেই) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল কলেজ। শুধু আমাদের কলেজ তো না, কয়েকদিনের মধ্যে একে একে বন্ধ হল প্রায় সমস্ত কিছুই। বিচ্ছিন্নতার বিশ্বব্যাপী বসন্ত নিদারুণ প্রকট তখন। সময়ের কারণে সেই নিদারুণতা হয়তো খানিক ফিকে হয়ে গেছে আমাদের অনেকের স্মৃতি থেকে, আরও অনেকটা যাবেও নিশ্চিত। কিন্তু নিবিড় করে চাইলেই স্মৃতির পথ পেরিয়ে আমরা সেই সময়টাকে, অসহায়তার সেই অসাড় অনুভূতিগুলোকে এখনও ছুঁয়ে ফেলতে পারি হয়তো!

যদিও মাসখানেক পেরিয়েই পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে থাকে এবং সর্বপ্রকারের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে ধীরে ধীরে খুলতে শুরু করে বন্ধ হয়ে যাওয়া সবকিছুই। কাজ চালানোর কানামামার মতো আমরাও প্রাথমিকভাবে আঁকড়ে ধরি অনলাইন নানান টিচিং-লার্নিং মাধ্যম একের-পর-এক। চেনা সেইসব কথার ধারাবিবরণী পেশ করে অকারণ এই লেখাকে গতরে বাড়াতে চাই না বলে, ওসব কথায় গেলাম না আর। তবুও ডিজিটাল ইন্ডিয়া হতে চাওয়া এক দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা যে বাস্তবিক

কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, তার কিছু হাতগরম নমুনা পেয়ে ওঠা সম্ভবপর হল এইসব অভূতপূর্ব অবস্থা এবং নিত্যনতুন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। কেউ কেউ অবশ্য এমনও ছিলেন, যাঁরা প্রকৃতই শেষটা জেনে এবং বুঝে যান বরাবর এবং বলা বাহুল্য যে অনেক আগে থেকেই, তাঁরা ভারত স্বাধীনতা পেলে ভাগলপুরও নিশ্চিত পাবের যুক্তিতে যাবতীয় নাদান প্রয়াসের প্রতি ঠোঁটের কোণায় করুণার হাসিটুকু সদা ঝোঝুল্যমান রেখে দিব্যি দূরে দূরে রইলেন।

অন্যদিকে আমাদের অনেকেরই তখন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পর্ব পেরিয়ে পরিস্থিতিকে কাজে লাগানোর, অভিশাপকে বরে রূপান্তরের জেদ চেপে বসেছে। কিন্তু সমাজমাধ্যম থেকে সংবাদমাধ্যম নাগাড়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে বুনে চলেছে শিক্ষকদের বসে বসে মাইনে পাওয়ার বৃত্তান্ত! যেন শিক্ষকরাই বসে থাকার জন্য কোভিডের মতো একটা পরিস্থিতির আয়োজন করেছে এবং স্কুল-কলেজ যাতে কিছুতেই না-খোলা হয়, সেই নিয়ে নিরন্তর আন্দোলন জারি রেখেছে। আর এই জনরোষে ক্রমাগত ঘি ঢালছে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে ঘটে যাওয়া একের-পর-এক দুর্নীতির খোলসা হওয়ার খবর! নোবেল থেকে শিক্ষকতা রাতারাতি এক্কেবারে আবেল-তোবেল প্রফেশনে পর্যবসিত হতে বসেছে যেন! আর তখন আমাদের কলেজ, চাঁপাডাঙার রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, নির্জন একাকী পরিত্যক্তই যেন-বা খানিক, একদা স্থানীয় কিছু মানুষের দিনবদলের স্বপ্নে বলীয়ান হয়ে সাফল্যের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে পালটে দিয়েছে যে প্রাকৃতিক-ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তবতা, তারই আদিম রূপে আবার চিরতরে মিলিয়ে যাওয়ার প্রহর গুনতে শুরু করেছে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে।

(৩)

সত্যকে যতই আমরা এক এবং অদ্বিতীয় করে ধরতে চাই-না-কেন, যতই তা অবিকল্প রূপে কল্পনা করতে চাই-না-কেন, তা যে মোটেই হওয়ার নয়, এর চেয়ে বেশি সত্য বোধহয় আর কিছু নেই। সুন্দর পোশাকে সেজে সকলের সামনে হাজির হই যখন, আড়ালের সত্য আড়ালই হয় মাত্র, মুছে যায় না। আবার নগ্নতার সত্য শরীরের বাইরের সীমান্তেই আছে ধরে নিলে, অন্তরের বয়ানকে স্থান দিই কোথায়! এভাবেই অন্তরের অন্তর নির্মাণের মাধ্যমে সত্যের অস্তিত্ব যেহেতু নিত্য গতিশীল, কোনো একটা কিছুকে বিচ্ছিন্নভাবে সত্য বলতে চাওয়াই যেন অবান্তর! বরং সেটাই যেন মিথ্যে। সেই মিথ্যে যাকে সাক্ষী রেখে সত্য নিজের বহমানতা বজায় রাখে।

সমস্ত কিছু খুলে গেলেও, এমনকি পুরোপুরি দস্তুর মতো রাজ্যে রাজ্যে নির্বাচন করা সম্ভবপর হলেও, স্কুল-কলেজ কেন খোলা সম্ভব হয়নি, সেই নিরেট যুক্তিপূর্ণ কারণগুলো তো আমরা সকলেই জানি। বিদ্রূপের ঢঙে কথাটা এখানে উপস্থাপন করলেও, বিদ্রুপের সুর অতিক্রম করে আপনাকে একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করব ওইসব প্রতিষ্ঠিত সত্যের আড়াল/অন্তরে প্রবহমান সত্যের কথাও। আচ্ছা নিয়োগ দুর্নীতি এই রাজ্যে শুধু যে শিক্ষাক্ষেত্রেই ঘটেছে এমন তো নয়, তাহলে এমন গণহারে চাকরি বাতিল করে দেওয়ার ঘটনা একাধিকবার শিক্ষকদের ক্ষেত্রেই ঘটল কেন! যাকে বলা হল বসে বসে মাইনে পাওয়া, ভালো বাংলায় তাকে যখন আমরা ওয়ার্ক ফ্রম হোম নামে চিনি, তা সেটা যাঁরা করেছেন এবং এখনও করছেন, তাঁরাও নির্বিকার চিত্তে প্রকাশ্যে গণমাধ্যমে শিক্ষকদের উদ্দেশে এমনটা বলে গেলেন কীভাবে! বললেন যুগের হাওয়ায়, হুজুগের বাতাসে। দুর্নীতি করে চাকরি পেয়ে, বসে বসে মাইনে পেয়ে,

সিনেমাটিক সিদ্ধান্তে রাতারাতি চাকরি হারিয়ে, আবার ফিরে পেয়েও আমরা যারা স্কুল-কলেজে (সরকারি) জুড়ে রইলাম তবু, তাঁরা কিন্তু কেউই তখন আর কোনো ব্যক্তিমাত্র নই, সামগ্রিকভাবে একটা সম্প্রদায়, যাদের এই সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতাই যেন চিরবিচারের শমনপ্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক, সরকারি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রহসনের এই প্রহেলিকাপর্বে সকলের ভাগ্যই এক সুতোয় বাঁধা পড়ল।

এসবই ঘটছে কিন্তু ঠিক তখন, যখন আচমকা মহামারীর বেমক্কা গোঁত্তায় দূরের বাস্তবটা এমনই ঝাপসে গেছে যে, হাতের মোবাইলকেই ঈশ্বর জ্ঞান করতে শুরু করেছে মানুষ। ওটাই একমাত্র খোলা দরজা, যা দিয়ে চার দেওয়ালের বাইরে বেরিয়ে পড়া তো যায়ই, চলে যাওয়া যায় বিশ্বের যে-কোনো প্রান্তে! এভাবেই ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞানে ছাত্র-অভিভাবক সকলেরই জানা হয়ে গেল যে, শিক্ষা-সাধনার পবিত্র পীঠ আর সরকারি আওতাভুক্ত নয় মোটে, অন্তত এ-বঙ্গে তো বটেই। স্কুলশিক্ষার স্তরে ব্যাপারটা খানিক অন্য প্রেক্ষিতে, ইংরেজি চালু-বন্ধের পিঠে চড়ে ঘটে গেছে বেশ অনেকদিনই হল। ২০০৪ সালে যখন আমার স্কুলের ১৭৫ বছর উপলক্ষ্যে সেখানে উপস্থিত হই, অনেক শিক্ষকের মুখেই শুনেছিলাম ২০০ বছর ছুঁতে পারা নিয়ে সংশয়ের কথা। ২০০৪ থেকে ২০২৪ সালে এই লেখা প্রকাশ পাওয়ার সময়ের মধ্যে, পশ্চিমবঙ্গে ওই ইংরেজির প্রশ্নেই বাতিল হয়ে উঠে গেছে হাজার হাজার সরকারি স্কুল; আর মাধ্যমিকে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান পরিগণিত হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সাফল্যের সরকারি সত্য হিসেবে। খোঁজ পাই মাঝে মাঝে আমার ওই প্রায় দুশো বছরের স্কুল, যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম অবধি জড়িত, দ্যা ওরিয়েন্টাল সেমিনারির ছাত্র সংখ্যা এখন নাকি ২০০-র তলায়! আমাদের সময় এক একটা ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা ওর কাছাকাছি থাকত! সত্যিই যদি ২০২৯ অবধি থেকেও যায় ওই স্কুল, হয়তো যাবেও, কোনোমতে টিকে থাকার বেশি একে কী-বা বলা চলে আর!

কলেজ শিক্ষায় ইংরেজি চালু-বন্ধের খেলাটা ততটা খাটেনি, যতটা কোভিডের খেলাটা খাটতে শুরু করেছে। নিতান্ত বাধ্যতা ব্যতিরেকে এইসব সাধারণ ডিগ্রি কলেজে নিজেদের যুক্ত রাখার কোনো কারণই আর কোনো ছাত্র-অভিভাবকের কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয় এখন। বাধ্যতার সঙ্গে কিন্তু শিক্ষা অর্জনের কোনো সম্পর্কের কথা যেন আবার কেউ ভেবে বসবেন না ভুল করে। এসবই এমন এক ধরনের বাধ্যতা, যার সঙ্গে আর আর অনেক কিছুর যোগ আপনি চাইলেই খুঁজে পেয়ে যাবেন কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ/অর্জনের কোনো যোগসূত্র পাবেন না কিছুতেই। স্বভাব তার্কিক এখানে এসে আমাকে কাটতেই পারেন কোনো ব্যতিক্রমী নজির উপস্থাপন করে অথবা এসব আগেও একই ছিল দাবি করে। তাহলে প্রথম তর্কে আমার জবাব হবে যে, কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যতিক্রম নয়, এই আলোচনায় ধরতে চাওয়া হচ্ছে সামগ্রিক প্রবণতার চরিত্র; আর দ্বিতীয় তর্কে জুড়তে চাইব এটুকুই যে কোনো কিছুকে নতুন আর মৌলিক বলার মধ্যে একটা ফারাক থাকে। এই আলোচনায় ধরতে চাওয়া সমস্যাগুলো মৌলিক না-হলেও নতুন, কাজেই পূর্বসূত্র থাকাটা খুবই স্বাভাবিক।

(৪)

নিও নর্মাল এবং ব্লেন্ডেড মোড, মুখ্যত এই দুটো শব্দকে ভিত্তি করে অবশেষে প্রায় বছর দেড়েক পরে, ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে অবশেষে খুলল কলেজ। ৮ নভেম্বর ২০২১ পঞ্চাশ পূর্ণ হবে কলেজের,

কিন্তু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কোনো আয়োজন করে ওঠা, বিশেষ করে ওই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে, কার্যত অসম্ভব ছিল। তবু খুব ছোটো করে একটা আয়োজন করা হয় এবং সেই অনুষ্ঠানেই ঘোষণা করা হয় যে আগামী বছর এই দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের নানান উদ্যোগ। দেড় বছর পর কলেজে ফিরতে পেরে তখন আমাদের সকলের এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও জীবনের স্বাভাবিক স্রোতে শামিল হতে পারার বাড়তি উত্তেজনা কার্যতই আগামীর ওই একটা বছরকে উদ্‌যাপনেরই বছর করে তোলে! ২০২২ সালে ৮ থেকে ১১ নভেম্বর চারদিন ধরে পালিত হয় সুবর্ণ জয়ন্তীর শেষ এবং চূড়ান্ত পর্বের উদ্‌যাপন! কী বিপুল পরিমাণ প্রাণশক্তির প্রকাশ যে ওই কয়েকদিন কলেজ প্রাঙ্গণের প্রতিটা কোণায় কোণায় দেখা দিয়েছিল, ভাষায় তাকে ব্যক্ত করতে পারা অন্তত আমার সাধ্যাতীত।

শুনেছি প্রদীপের ক্ষেত্রে নিভে যাওয়ার আগে উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে ওঠার মুহূর্তের কথা। জীবনের নানান ক্ষেত্রে বারংবার ওই দৃষ্টান্ত ব্যবহৃত হতেও দেখেছি। এতক্ষণ ধরে কলেজ শিক্ষাস্তরে যে সংকটের ভূমিকা করছিলাম, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই কার্যত পরিলক্ষিত হতে শুরু করে তার ফলাফল। সদ্য সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের কয়েক মাস পার করতে-না-করতে রাজ্যের অন্যান্য কলেজের মতোই আমাদের রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়েও সেই প্রভাব পরিলক্ষিত হতে শুরু করে। পরিণতি এমন দাঁড়ায় যে, মাত্র একটা বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কলেজে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষকে বিভিন্ন কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণের কথা চিন্তা করতে হয়।

এরই মধ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকেই কলেজে নিউ এডুকেশন পলিসি ২০২০ অনুযায়ী পঠন-পাঠন শুরু হয়ে যায়। সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা অনার্স-পাসের যে বিভাজন, এই নতুন নিয়মে সেটা যে শুধু পালটে গেল তা-ই নয়, তিন বছরের জায়গায় চার বছরেও স্নাতক হওয়া থেকে শুরু করে কোর্সের মাঝে বেরিয়ে যাওয়া অথবা পরে আবার ফিরে আসা ইত্যাদি নানান বিষয় এমন একটা সময় ছাত্রছাত্রীদের সামনে এসে হাজির হয় যখন তারা এই ধরনের সাধারণ ডিগ্রি করে পড়াশোনা করার কার্যকারিতা সম্বন্ধেই খানিক সন্দিহান হয়ে পড়েছে। নিউ এডুকেশন পলিসি ভালো নাকি খারাপ, আশীর্বাদ নাকি অভিশাপ, সে-নিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় এখনও আসেনি। তবু কিছু কিছু কথা এই সূত্রে এমনভাবেই এসে পড়েছে যে বিষয়টাকে সম্পূর্ণত এড়িয়ে যাওয়াও চলে না।

আসলে এই পলিসির সব থেকে জোরের একটা জায়গা হল শিক্ষাকে প্রায়োগিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা। প্রচলিত প্রবাদে আছে লেখাপড়া করলে গাড়িঘোড়া চড়তে পারার ক্ষমতা তৈরি হওয়ার কথা। লেখাপড়া করার সঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের এই প্রেক্ষিত আধুনিক কালের শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার শর্ত হয়ে আছে। অবশ্য কোনোকালেই শিক্ষা ক্ষমতায়নের রাজনীতিকে এড়িয়ে আদৌ চলেছিল কিনা কোনো দেশে, সে বিষয়ে তর্কের যথেষ্টই অবকাশ এ-লেখায় না-থাকলেও বাস্তবিক যথেষ্টই আছে। সেদিক থেকে দেখলে তো কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে এমন একটা পলিসিকে স্বাগত জানানোর ক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয়। দ্বিমত আমরাও যে এই লেখায় খুব দৃঢ়ভাবে কিছু তুলে ধরতে চাই তেমনও নয়। শুধু সার্বিক পরিস্থিতির নিরিখে এবং আমাদের কলেজের মতো প্রতিষ্ঠানের বাস্তবতার নিরিখে এই পলিসিকে কেন্দ্র করে মাথায় আসা কিছু প্রশ্নের অবতারণার মাধ্যমে এই লেখার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই।

(৫)

রাজ্যের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরেরর শিক্ষা ব্যবস্থায় এখন সবথেকে বড়ো যে চ্যালেঞ্জটা এসে দাঁড়িয়েছে, সেটা ছাত্র সংখ্যা ধরে রাখার। নানান ধরনের স্কলারশিপ তবু একভাবে ছাত্রদের কলেজের সঙ্গে যুক্ত রাখায় খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা নিচ্ছে। এবং ওই স্কলারশিপটুকু পাওয়া ব্যতিরেকে এখান থেকে কাজে লাগার মতো কিছু যে পাওয়ার আছে, সেই বিশ্বাস তাদের মধ্যে প্রায় বিলীন হতে বসেছে। বরং তারা এখন অনেক বেশি আগ্রহী সেই ধরনের কোনো প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হতে, যেখান থেকে কোর্সের শেষে সামান্য আয়ের হলেও অন্তত কোনো কাজের নিশ্চিন্তি আছে। নিউ এডুকেশন পলিসি এই বাস্তবতাকে মাথায় রেখেই এক ধরনের সমাধানের পথ তৈরি করতে চায় বটে কিন্তু ঢাল-তরোয়াল বিহীন নিধিরামের দ্বারা সর্দারির কাজ চিরকালই যেমন হয়েছে, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত অধিকাংশ কলেজের ক্ষেত্রেই তার বেশি কিছু হয়ে ওঠাটা সত্যিই সম্ভব হবে কিনা, সেটাই এখন একটা প্রাথমিক স্তরের প্রশ্ন।

সোজা কথায় বলতে গেলে আসলে বলতে চাইছি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কলেজের, যেমন আমাদের রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, পরিকাঠামোগত দুর্বলতার বাস্তবিক চেহারাটার কথা। এই চেহারা যে শুধু আমাদের কলেজেরই ব্যতিক্রমীভাবে খারাপ, এমনটা তো নয়। দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামোগত উন্নতির নেপথ্যে কাজ করতে থাকা নানান নীতি-রাজনীতির অলিগলিতে সুবিধা করে উঠতে না পারার কারণে, দিকভ্রান্ত এই অবস্থা এ-রাজ্যের অনেক কলেজেরই। এর মধ্যে পূর্বে আলোচিত নানান জানা-অজানা কারণে কমতে থাকা ছাত্র সংখ্যা, এইসব কলেজগুলোর পরিচালক বর্গের কপালে পাথেয় জোগাড়ের প্রশ্নে চিন্তার বাড়তি ভাঁজ ফেলতে শুরু করেছে। যুগের দাবিতে ইতিমধ্যে যে ব্যবস্থাটা জীর্ণ-পুরাতনে প্রতিপন্ন হয়েছে, সেটাকে ধরে রাখতে পারাই এইসব কলেজের সামনে এখন রীতিমতো একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ। কিন্তু যা বাতিল, তা যে সংস্কারের মুখাপেক্ষীও। সংস্কার ব্যতিরেকেও তাকে যে কিছুতেই রক্ষা করা সম্ভব নয়। নিউ এডুকেশন পলিসি নিয়ম মোতাবেক মিলিয়ে দিচ্ছে অনেক কিছুই। কিন্তু নিয়মকে প্রায়োগিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পরিকাঠামো প্রয়োজন, তার আয়োজনে কে/কারা যে এসে দাঁড়াবে কলেজগুলোর পাশে, তার কোনো সদুত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

নুন আনতে পানতা ফুরোনো সংসারে পণের টাকা জোটাতে না পারায় 'সৎপাত্র' হাত ছাড়া হয় হয়ের বাস্তবতা, দেশের কথা জানি না, কিন্তু এখন এ রাজ্যের বহু কলেজেই। আর একটু অন্য দিকে তাকালেই দেখতে পাচ্ছি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বেসরকারি দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিত্যনতুন ছন্দে ছড়িয়ে পড়া উপস্থিতি। এতদিন বুঝেই পাচ্ছিলাম না ছাত্ররা ক্রেডিট কার্ডটা নিয়ে করবেটা কী! আমাদের এই ধরনের কলেজে পড়ার যে খরচ, তা তো তাদের স্কলারশিপ থেকেই দিব্যি মিটে যাওয়ার কথা! তাহলে এই কার্ডের কার্যকারিতাই-বা কোথায় আর তা নেওয়ার জন্য ছাত্রদের এত বোঝানোর তোড়জোরই-বা কেন! এখন যেন ছবিটা আস্তে আস্তে খানিক স্পষ্টতা লাভ করছে। কথায় আছে ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেও ভয় পায়। কিন্তু অভয়লাভের আশা যেহেতু এখনও পুরোপুরি ছেড়ে উঠতে পারছি না, লিখে রাখতে চাইছি ভয়ের কথাগুলোই; যদি কেউ সে-শুনে অভয়দানে উৎসাহ বোধ করেন, অগত্যা!

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ আসলে একটা সময়কেই তো চিহ্নিত করে এবং সেই সময়ের প্রেরণায় এই সংকলনে অনেকেই তুলে এনেছেন কলেজের অতীত এবং ইতিহাস। আমার পথটা এখানে বলা বাহুল্য

খানিক উলটো। আমি এই লেখায় চেষ্টা করলাম আমার কর্মক্ষেত্রের প্রেরণায় এই সময়টার এবং একটা আনুমানিক আগামীর অথবা তার কিছু ইঙ্গিতমাত্রকে বুঝতে।

উন্নততর পরিকাঠামোর প্রশ্নে, সুনিশ্চিত অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্মাণের প্রশ্নে ভাবা আর করে ফেলার মধ্যেও যেহেতু খুব স্পষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে সেই অর্থেরই প্রশ্ন, তাই প্রথম কথাটা হল সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত এইসব প্রতিষ্ঠানে সরকার ব্যতিরেকে তার জোগান দেবে কে! কী হবে সেই পদ্ধতি? আদৌ তা পাওয়া সম্ভব কিনা পেরিয়েও আছে কে কতটা পাবে, কেন এবং কীসের ভিত্তিতে পাবে, কীভাবে পাবে ইত্যাদির জটিল মারপ্যাঁচ। অবশ্য সেই যাঁরা সবটাই জানেন এবং বুঝে ফেলেন অনেক অনেক আগেই, তাঁরা এবারও কী যেন একটা বুঝে ফেলেছেন কিন্তু সেটা এখনও ঠিকমতো ঝেড়ে কাশছেন না!

আর নিরেট বোকার মতো আমরা যারা সময়টাকে দেখতে গিয়ে ভেবলে গেছি, গুলিয়ে ফেলতে শুরু করেছি কর্মনৈতিক বোঝাপড়া, হাতিয়ার হিসেবে একমাত্র ধরে রাখতে চাইছি নিজেদের উদ্যম; রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সূত্রে উঠে আসা অতীতকথা, এর হয়ে ওঠার বৃত্তান্ত, এর ইতিহাস, পারবে কি আরও কিছুকাল অনিবার্য হতাশার হাত থেকে আমাদের আগলে রাখতে!

সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
আহ্বায়ক, সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি

অর্ধশতকে ফিরে দেখা: একটি পর্যালোচনা (১৯৭১-১৯২১)

কোনো জাতির সংস্কৃতি আর ইতিহাস না থাকলে সেই জাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না। ইতিহাস ও সংস্কৃতি থাকলেও তা যদি না লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহলেও তা মহাবিপদ ডেকে আনবে কারণ পরবর্তী প্রজন্ম সেই বিষয়ে কোনো জ্ঞানলাভ করতে সমর্থ হবেন না। তাই অন্তত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে স্মরণ ও মনন করার তাগিদে ইতিহাস লেখার প্রয়োজন। রবীন্দ্র পূর্ববর্তী যুগের স্বনামধন্য কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বাংলার ইতিহাস রচনার প্রথম প্রেরণাদাতা হিসেবে অভিহিত করা হলে তা অত্যুক্তি হবে না। ঊনবিংশ শতকের একেবারে শেষলগ্নে উক্ত বিষয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহ এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। ১৯০৫ সালে বাংলায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে দেশপ্রেমের আবহ তৈরি হয়েছিল সেই সময়ে তাঁর কতক প্রচেষ্টায় দেশের ইতিহাস উদ্ধার করে তা রচনা করার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল বাঙালি জনমানসে। যে-কোনো জাগ্রত ও সচেতন জাতিমাত্রেরই ঐতিহাসিক চেতনা থাকে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, '...ইউরোপীয়েরা অত্যন্ত গর্বিত; তাঁহারা মনে করেন, আমরা যাহা করিতেছি, ইহা আমাদিগের কীর্তি, অতএব তাহা লিখিয়া রাখা যাউক। এই জন্য গর্বিত জাতির ইতিহাসের বাহুল্য; এই জন্যই আমাদের ইতিহাস নাই। ...ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী।' ("বাঙ্গালার ইতিহাস", *বঙ্গদর্শন* ১২৮১ মাঘ)। ১৮১৪-১৯০৫ সাল ছিল বাংলার যথার্থ ইতিহাস রচনার উদ্‌যোগপর্ব। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি জাতিকে একদিন আহ্বান করলেন ইতিহাস উদ্ধারে ব্রতী হবার জন্য— 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে তাহা ইতিহাস নয়। ...বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। ...আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য; সে ততদূর করুক; ...একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত *বাঙ্গালার ইতিহাস* (১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ) বাংলা দেশের প্রথম পুরাবৃত্তগ্রন্থ বলা যেতে পারে। তবে বাংলার ইতিহাস রচনার নবযুগের কান্ডারি ছিলেন সম্ভবত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় (১৮৬১-১৯৩০)।

মোঘল সম্রাট আকবরের আমলে ভারতবর্ষের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন প্রশাসনিক বিভাগ ছিল যথাক্রমে সুবা (প্রদেশ) ও গ্রাম। তাঁর সভাসদ আবুল ফজলের *আইন-ই-আকবরী* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, রাজস্বমন্ত্রী তোডরমল বাংলা সুবাকে উনিশটি (১৯) সরকারে (জেলা) বিভক্ত করছিলেন। এগুলির মধ্যে সাতগাঁও,

সুলাইমানাবাদ এবং মান্দারান সরকার ছিল অন্যতম। তখন প্রতি সরকার আবার বহু সংখ্যক মহলে বিভক্ত ছিল। এই সাতগাঁও সরকার আবার তিপ্পান্নটি (৫৩), সুলাইমানাবাদ একত্রিশটি (৩১) এবং মান্দারন ষোলোটি (১৬) উপজেলা বা পরগণা বা মহলে বিভক্ত ছিল। বর্তমান হুগলি জেলা সম্ভবত উপরিউক্ত তিনটি সরকারের অধীনে একাধিক মহল জুড়ে বিস্তৃত ছিল। তবে একথা বলা সমীচীন হবে যে, বর্তমান হুগলি জেলার অধিকাংশ স্থান সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) সরকারের এক বা একাধিক মহলে বিভক্ত ছিল। কিংবা উত্তর হুগলি সুলাইমানবাদ এবং দক্ষিণ হুগলি সাতগাঁও সরকারের অন্তর্গত একটি মহল ছিল। বাকি কিছুটা অংশ সম্ভবত মান্দারন সরকারের অধীনে কোনো মহল ছিল। এখনও পর্যন্ত যা জানা যায় সম্ভবত 'হুগলি' নামটি 'হোগলা' থেকে এসেছে। এটি একটি লম্বা খাগড়া যা নদীর তীরে এবং তার নীচে জলাবদ্ধ নীচু জমিতে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। অন্যমতে, 'হুগলি' নদী থেকে এই জেলার উক্ত নাম উদ্ভূত হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ১৪-টি জেলায় বিভক্ত ছিল যার মধ্যে হুগলি ছিল অন্যতম একটি জেলা। যাইহোক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেগুলেশন XXXVI দ্বারা ১৭৯৫ সালে প্রশাসনিক সুবিধার্থে বর্ধমান জেলাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। উত্তর বিভাগকে বর্ধমান এবং দক্ষিণ বিভাগ হুগলি নামে পরিচিত হয়। ১৯১১ সালের জনগণনা অনুসারে এই জেলার মোট জনসংখ্যা ১, ০৯০, ০৯৭ জন। বর্তমান হুগলি জেলার অন্তর্গত চারটি মহকুমা— শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর এবং আরামবাগ। বর্তমান চন্দননগর মহকুমার অন্তর্গত তারকেশ্বর ব্লকের একটি গ্রাম হল চাঁপাডাঙা। সম্ভবত 'চাঁপানগর' থেকে উক্ত গ্রামের নামকরণ 'চাঁপাডাঙা' হয়েছে। আরামবাগ থেকে ২০ কিমি এবং তারকেশ্বর থেকে ৮ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। কলকাতা ও হাওড়া থেকে এই অঞ্চলের যোগাযোগ খুবই ভালো। এটি ২২.৮৩° উঃ এবং ৮৭.৯৬° পূঃ কোণে অবস্থিত। দামোদর নদীর তীরের এই চাঁপাডাঙা অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে পুরনো বেনারস রোড বা বর্তমান অহল্যাবাই রোড গেছে, যেটি বরাবর গেলে উত্তরপ্রদেশের বেনারসে পৌঁছোনো যাবে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে চাঁপাডাঙার জনসংখ্য ১২, ৫১৮ জন। এঁদের মধ্যে ৬, ৩৪৩ জন (৫১%) পুরুষ আর ৬, ১৭৫ জন (৪৯%) মহিলা। ছয় বছরের নীচে জনসংখ্যা ১, ১৬৭ জন। এলাকাটি কৃষিকাজে সমৃদ্ধ এবং বহুসংখ্যক কোল্ড স্টোরেজ থাকায় চাঁপাডাঙার অর্থনীতি তুলনামূলকভাবে বেশ উন্নত। হাওড়া থেকে আমতা পর্যন্ত মার্টিন কোম্পানির লাইট রেলওয়ে ১৯০৮ সালে চাঁপাডাঙা পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়েছিল যা ১৯৭১ সাল অবধি কার্যকর ছিল। উপরিউক্ত সবকিছু থাকলেও উচ্চশিক্ষার অভাব এই অঞ্চলের বিশিষ্ট মানুষদের সংঘবদ্ধ করেছিল একটা কলেজ বা মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য। তাঁদের অধ্যবসায় ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯৭১ সালের ৮-ই নভেম্বর চাঁপাডাঙায় 'রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়' নামক একটি কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। এলাকাবাসীদের কাছে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'চাঁপাডাঙা কলেজ' নামেই সমধিক পরিচিত। অতএব এখন স্মৃতির সরণি বেয়ে এই বিষয়ে আলোকপাত করা কর্তব্য। কারণ বিগত ২০২১ সালটিতে আমাদের অতিপ্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির অর্ধশতক পূর্ণ হয়েছে। যদিও আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত ১৯৭১-১৯২১ সময়কালের ঘটনাবহুল কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। তবে কিছু দলিলপত্র আর পুরোনো রেকর্ড এবং তৎকালীন বিদ্বজ্জনেদের মধ্যে থেকে (যাঁরা এখনও জীবিত আছেন) সাক্ষ্য বিবরণ সংগ্রহ করে ফরাসি ঐতিহাসিক মার্ক ব্লকের ভাষায় একটা 'টোটাল হিস্ট্রি' রচনার আন্তরিক প্রয়াস আশা করি সকল ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

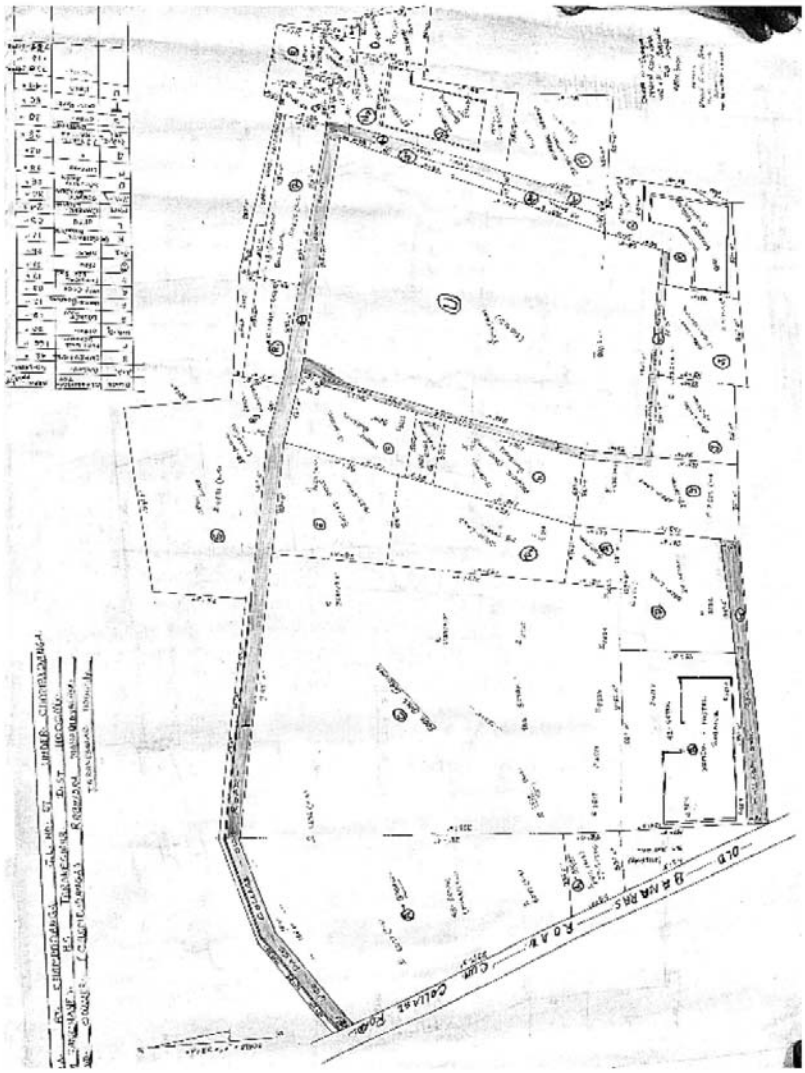

প্রধান ক্যাম্পাসের মানচিত্র

সময়টা ১৯৬০-এর দশকের একেবারে সূচনালগ্ন। বিশ্ববরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ (১৯৬১) পালনের উদ্যোগ চলছিল রাজ্যে তথা দেশের নানাদিকে। কথিত আছে, চাঁপাডাঙা সন্নিহিত পুরশুড়া অঞ্চলেও কতিপয় গ্রামের মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহ ও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে উক্ত অনুষ্ঠান পালনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে উক্ত অনুষ্ঠান চলাকালীনই কমিটির সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এলাকায় একটি কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ব্যক্ত করেন এবং কমিটির অন্যান্য প্রায় সকল সদস্য উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করেন। ১৯৬১ সালে কবিগুরুর ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন-এর অনুকরণে চাঁপাডাঙা এলাকায় দুটি প্রতিষ্ঠান (শিক্ষামূলক ও কর্মমূলক) তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই ভাবনার বীজ-ই পরবর্তীকালে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে বাস্তবের মাটিতে অঙ্কুরোদ্‌গম করে এবং ধীরে ধীরে তা সুবৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়। রবীন্দ্রস্মরণ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার পর থেকেই পরিকল্পিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির জন্য কোনো একটি সুবৃহৎ স্থানের অনুসন্ধান শুরু হয়। এই আবহেই মাঝে বেশ কয়েকটি বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। যদিও সুপ্তবাসনা মাঝে মাঝে কমিটির সদস্যদের ভাবিয়ে তুলতে থাকে। শেষে চাঁপাডাঙার নিতাইচন্দ্র হাজরা মহাশয়ের প্রায় নয়-দশ বিঘা একটি জমির (একটি ফাঁকা মাঠ বা বালির মাঠ) খোঁজ পাওয়া যায় এবং তিনি তাঁর ওই জমি তৎকালীন প্রস্তাবিত মহাবিদ্যালয়ের জন্য দান করতে তাঁর সম্মতির কথা জানান। এইভাবে ভাবীকালের চাঁপাডাঙা কলেজের গোড়াপত্তন হল। তবে এই পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। যাইহোক ইত্যবসরে চাঁপাডাঙার স্থানীয় সুধীজনবৃন্দ, যথা শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী, ব্যবসায়ী প্রমুখ এই অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হলেন। শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারী মহাশয় এক্ষেত্রে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব, যিনি এই দেশগঠনের কাজে অন্যতম অংশীদার হয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরের সম্ভবত প্রথম সপ্তাহে চুঁচুড়া রেজিস্ট্রি অফিসে উক্ত দানকৃত জমির রেজিস্ট্রি সম্পাদনের কাজ সুসম্পন্ন হয়। শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারী মহাশয় স্ট্যাম্প পেপারের জন্য প্রায় ১৯০০০ টাকা অর্থদান করেন। এরপর উক্ত জমির উপর একটি ভবন নির্মাণের জন্য নকশা তৈরি করা হয়। এদিকে এলাকায় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খবরে স্থানীয় মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। সেই নকশা অনুযায়ী ভিত খোঁড়ার কাজ শুরু হয়। চাঁপাডাঙা ও তার নিকটস্থ অঞ্চলের অনেক মানুষই এই কর্মযজ্ঞে স্বেচ্ছায় শ্রমদান করেছিলেন। তবে কিছুদিনবাদেই অর্থের অভাব হওয়ায় সহৃদয় ব্যক্তিত্ব শ্রী নিতাইচরণ হাজরা মহাশয় পুনরায় তাঁর সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি আবার ২০, ০০০ টাকা নগদ অর্থ দান করেন। এছাড়াও তারকেশ্বর মন্দির কর্তৃপক্ষ (এস্টেট) ৫,০০০ টাকা অর্থসাহায্য করেছিলেন। মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিকিউরিটি ডিপোজিট ২৫, ০০০ টাকা দান করেন পুরশুড়ার রণবাজপুরনিবাসী চাঁপাডাঙার ব্যবসায়ী শ্রী মনীন্দ্রনাথ রায়। তিনি পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারের বই কেনার জন্য আরও প্রায় হাজার দশেক টাকা মুক্ত হস্তে দান করেন। এছাড়াও বিভিন্ন উপায়ে অর্থসাহায্য এসেছিল কলেজভবন নির্মাণে। যেমন, চাঁপাডাঙাতে প্রতি পণ্যদ্রব্য ভর্তি লরি থেকে ২ টাকা চাঁদা নেওয়া হত। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব মহাবিদ্যালয়েরই শিক্ষাকর্মী শ্রদ্ধেয় সুদামচন্দ্র বেরা মহাশয় যিনি লরি বা ট্রাক চালকদের থেকেও চাঁদা গ্রহণ করতেন কলেজের উন্নয়নকাজে অগ্রগতি আনার জন্য। জনশ্রুতি আছে যে চাঁপাডাঙা ব্যবসায়ী সমিতি কলেজভবন নির্মাণের জন্য একটি 'শিক্ষাবৃত্তি' চালু করেছিলেন। প্রতি মণ লেনদেনে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়কেই সম্ভবত এক আনা করে শিক্ষাবৃত্তি দিতে হত। এখানে কলেজকে যাঁরা জমিদান করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে থেকে যাঁদের নথিপত্র আমাদের কাছে বর্তমান সেই সহৃদয় ব্যক্তিবর্গের নাম, পরিচয় এবং জমির পরিমাণ ইত্যাদি দেওয়া হল। নীচের তালিকায় নাম নেই

অথচ জমিদান করেছেন এমন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থাকলে ত্রুটি মার্জনা করবেন এবং অনুগ্রহ করে অতিসত্বর আমাদের সেবিষয়ে অবগত করবেন বলে আশা রাখি।

জমি দান

ক্রম	মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং	শতক	জমিদাতা	নিবন্ধীকরণ
১।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	৬৪১	আর. এস. ২৬৩৬ (এল. আর. ৩২৯৫ ও ৩২৯৬)	৩০৭ (১২২ ও ১৮৫)	শ্রীমতি ফেলুবালা দাসী	৪/১২/১৯৬৪
২।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	২২২৫	আর. এস. ২৬৩০	০৫	যতীন্দ্রনাথ খামরুই	২৯/০১/১৯৬৫
			আর. এস. ২৭৮৫			
			আর. এস. ২৭৭৯ (এল. আর. ৩২৯৭)	০৮ ০৯		
৩।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	৬২০	আর. এস. ২৬৩২	৩০	শ্রীমতী দুর্গাবালা চক্রবর্তী	২০/০৭/১৯৬৫
৪।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	৬৮২	আর. এস. ২৭৮৬	১৭	গিরীশ মাইতি	২৬/১১/১৯৬৫
			আর. এস. ২৬৩০	১০		
৫।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	২৯৪	আর. এস. ২৭৭৮	১০	ক্ষুদিরাম মান্না (বলরামপুর, পুরশুড়া, হুগলি)	১৯/০৪/১৯৭৬
			আর. এস. ২৭৮৪	০৬		
৬।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	১৭৭৯	আর. এস. ২৭৮২	০২	অসিতবরণ হাজরা	২৮/১২/১৯৭৯
৭।	জগন্নাথপুর (ক্রম নং—৩১) (প্রধান ক্যাম্পাসের বাইরে)	৮৪	আর. এস. ১০১	৫৫	যতীন্দ্রনাথ ভৌমিক	২৭/০৭/১৯৬৫
			আর. এস. ২৮৬	২৫		
৮।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	১৩৬৯	আর. এস. ২৬৩০	০৫	রোহিণী ধাওয়া	২৯/০১/১৯৬৫
৯।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	৫১৯	আর. এস. ২৬২৩	০৫	ললিত মোহন ঢ্যাং	২৯/০১/১৯৬৫
১০।	বেড়েমূল (ক্রম নং—৭০) (প্রধান ক্যাম্পাসের বাইরে) ময়রার ডাঙা	১১২২	এল. আর. ৬৪	২৮	* প্র বোনো সমবায় সমিতি (১১৬-৫১.৫# = ৬৪.৫)	২০০৭-২০০৮
১১।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	১২০	আর.এস. ২৬১৯/৬০৭৭ ২৬১৯/৬৩২৪	৫০	রোহিণী ধাওয়া	০৪/০১/১৯৮০
১২।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	৫১৯	আর.এস. ২৬২৪	১০.৫	ললিত মোহন ঢ্যাং	১৯৬৫
মোট দান ৭৮৪.৫ শতক-৫১.৫# = ৭৩৩ শতক						

** প্র বোনো নামক একটি সমবায় সংস্থার জমি ছিল এটি। কলেজের দক্ষিণদিকে যেখানে প্র বোনো পাবলিকো কো-অপারেটিভ এর ২৩০ শতক (প্রায় ৬.৯৬ বিঘা) জমি ছিল যা কলেজকে দান করে দেওয়া হয়। প্র বোনো একটি ল্যাটিন পরিভাষা, যার অর্থ 'লোকহিতার্থে''। কলেজ কর্তৃপক্ষ তার এই বেড়েমূল মৌজার অন্তর্গত দানে পাওয়া জমি এল. আর. ৬২-র অন্তর্গত ১১৬ শতক থেকে প্রায় ৫২ শতক (৫১.৫) জমি আবার চাষিদের দান করেন। ১১৬-৫১.৫= ৬৪.৫ শতক।*

শুধু দান নয় কলেজ কর্তৃক সুদীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে বেশ কিছু জমি ক্রয় করা হয়। উক্ত জমির বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল— (জমি দান ও ক্রয় মিলিয়ে মহাবিদ্যালয়ের বর্তমানে আনুমানিক প্রায় ১৪ একরের কাছাকাছি জমি রয়েছে। তবে এখানে সর্বমোট ১৩৩১.৪১ শতক বা প্রায় ১৩.৩২ একর জমির বিবরণ দেওয়া হয়েছে)।

জমি ক্রয়

ক্রম	মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং	শতক	জমি ক্রেতা	নিবন্ধীকরণ
১।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	২০২৯/৫, ২২৭৮	এল. আর. ২২৯২, (আর. এস. ৫৮২৬)	৯৬	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	২০০৭
		২০২৯/৫, ২২৭৮	এল. আর. ২৪১৩, (আর. এস. ৫৬৭৮/৬০১৯)	৪২		
		২০২৯/৫, ২২৭৮	এল. আর. ২৪১১, (আর. এস. ৫৬৮৭)	৬২		
		২০২৯/৫, ২২৭৮	এল. আর. ২৩১১, (আর. এস. ৫৮২২)	০৫		
		২২৭৮	এল. আর. ২৩১২, (আর. এস. ৫৮২৩)	০১		
	(কলোনির ৩৩৭ শতক)	২০২৯/৫, ২২৭৮	এল. আর. ২৩১৪, (আর. এস. ৫৮২৫)	১০		
	(প্রধান ক্যাম্পাসের বাইরে)	২০২৯/৫, ২২৭৮	এল. আর. ২৪৭৯, (আর. এস. ৫৬৭৯)	১৯		
		২০২৯/৫, ২২৭৮	এল. আর. ২৩১০, (আর. এস. ৫৮২১)	৭৬		
		১১৩৬	আর. এস. ৫৮২৪, (এল. আর. ২৩১৩)	২৬		
২।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	১৮৪	এল. আর. ৩২৯০, (আর. এস. ২৬২৬)	১৫	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	২০০৬
		১৮৪	এল. আর. ৩২৮৭, (আর. এস. ২৬২১)	১৬		
		১৮৪	এল. আর. ৩২৯১, (আর. এস. ২৬২৫)	০৬		
		১৮৪	এল. আর. ৩২৮৯, (আর. এস. ২৬২৪)	১০.৫		
		১৮৪	এল. আর. ৩২৮৮, (আর. এস. ২৬২৩)	০৫		
	(ছাত্রী নিবাস ৯১ শতক)	১৮৪	এল. আর. ৩২৮৫, (আর. এস. ২৬১৭)	০৩		
		১৮৪	এল. আর. ৩২৮৬, (আর. এস. ২৬১৮)	১৪		
	কলেজের দক্ষিণ দিক	১৮৪	এল. আর. ৩২৮৯, (আর. এস. ২৬২৪)	১০.৫		
		১৮৪	এল. আর. ৩২৮৮, (আর. এস. ২৬২৩)	০৫		
		১৮৪	এল. আর. ৩২৯১, (আর. এস. ২৬২৫)	০৬		২০০৯
৩।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭) বটতলা	—	এল. আর. ৩২৮৪ (আর. এস. ২৬১৬)	৩.৬০	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	২০০৮
				২.৭০		২০১০
				২.২৫		২০০৯
৪।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	৮৪৪	আর. এস. ২৬২২ (৩৩)	১১.৫	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	২১/০৪/৮০
				২১.৫		১৯৮০
৫।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	১৭৮০	আর. এস. ২৭৮২	০৬	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১৫/০৪/৮১
৬।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	৯৮৫	আর. এস. ২৬২৮	১২.৫	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৩০/০১/৮৬
৭।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	৯৮৫	আর. এস. ২৬২৮	১২.৫	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	০৪/০২/৮৬
৮।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	১৯৩১	আর. এস. ২৬৩৮/৬১০০	১২	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	২৭/০৭/৮৯

ক্রম	মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং	শতক	জমি ক্রেতা	নিবন্ধীকরণ
৯।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	১৩১২/২১১৪	আর. এস. ২৬৩১ এল. আর. ৩২৮০	৩৩	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	০৩/০৬/৯৪
১০।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	২৯৪	আর. এস. ২৭৬৫	১১	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	০৫/০৫/০৪
১১।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	২৯৪	আর. এস. ২৮০১ (বিনিময়ে গেল ১১ শতক) *	১১	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	০৫/০৫/০৪
১২।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	১৪৫	আর. এস. ২৯৫৩ (বিনিময়ে কলেজ পেলো ১১ শতক)*		রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	০৮/০২/০৫
১৩।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	৫৮০	আর. এস. ২৭৮৬ এল. আর. ৩৩০২	৪.২৫ ৬.৬ ১	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	২০২১
১৪।	চাঁপাডাঙা (ক্রম নং—৬৭)	—	এল. আর. ৩২৮১	২০	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	—
মোট ৫৯৮.৪১ শতক জমি ক্রয় করা হয়েছে। (পাঁচশো আটানব্বই দশমিক একচল্লিশ)						

কিন্তু আবার কয়েক বছরের জন্য মহাবিদ্যালয়ের কাজ থমকে যায়। কারণ সবেমাত্র দুই দশক অতিক্রান্ত হয়েছে ইংরেজদের হাত থেকে ভারত রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছে। একদিকে বেকারত্ব ও অন্যদিকে সীমাহীন দারিদ্রের কবলে দেশের অগনিত মানুষ। তাই সমগ্র দেশের অর্থব্যবস্থা যে শোচনীয় ও ভঙ্গুর ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নেহেরুর নেতৃত্বে 'জোট নিরপেক্ষ' গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ভারত কোনো বড়ো শক্তির থেকে সাহায্য পাওয়ার খুব বেশি আশা পোষণ করত না। দেশের কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্য সরকার থেকে তাই মহাবিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়ে তেমন কোনো আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়নি। তাই দেশসেবার কাজে ব্রতী হতে এগিয়ে আসেন স্বদেশহিতৈষী সাধারণ মানুষ। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন পরিস্থিতিতে তাঁরা কলেজস্থাপনার কাজে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আত্মনিয়োগ করেন। সকলের নাম, পরিচয়ের ইতিবৃত্ত আজ আর আমাদের কাছে নেই। ইতিমধ্যে পাঁচটি দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। যাইহোক ভারতে দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে বিগত শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে। এই দুটি দশককে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিশেষ করে সদা 'উত্তাল দশক' হিসেবে মনে রাখবেন। ১৯৬৭ আর ১৯৬৯ সালের পর পর দুটি বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। অন্যদিকে আমাদের রাজ্যে বামপন্থী দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি হতে লাগল। এই রাজনৈতিক আঁচ কলেজ নির্মাণেও প্রভাব ফেলে এবং উক্ত কাজে বিলম্ব ঘটে। তবে এই ঘনীভূত আশাআশঙ্কার মেঘ কাটিয়ে পুনরায় কলেজ নির্মাণে গতি আসে। অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক মহাশয়সহ আরও কয়েকজন ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে মহাবিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয় এবং তৎকালীন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মহাবিদ্যালয়গুলির পরিদর্শক আর্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপারিশক্রমে কলেজ সরকারি অনুমোদন লাভের দিকে এককদম এগিয়ে যায়। অতঃপর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫-১০-১৯৭১/০১-১১-১৯৭১ তারিখের আই/সি/৪৩৭/৭১ সংখ্যক পত্র অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রস্তাবিত রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। ১৯৭১ সালের ৫-ই নভেম্বর গঠিত একটি সভায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে এজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এই শুভক্ষণে চাঁপাডাঙার এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথা কলেজ প্রতিষ্ঠাতা সদস্যসকল উপরিউক্ত মহতি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে একটি আঠারো জন সদস্যের প্রিপারেটোরি বা প্রস্তুতি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির কার্যকাল ছিল মোটামুটি ১৯৭১ সাল থেকে পরবর্তী দুই বছর (১৯৭১-১৯৭৩) পর্যন্ত। এই কমিটির প্রথম সম্পাদক এবং সভাপতি নিযুক্ত হলেন যথাক্রমে অধ্যাপক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ আদক মহাশয় এবং শ্রীপ্রসাদচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়। কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হল নন্দলাল দত্ত মহাশয়কে। এঁরা সকলেই মহাবিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। উক্ত কমিটির স্বনামধন্য সদস্যরা ছিলেন নিম্নরূপ—

১।	শ্রী প্রসাদ চন্দ্র মণ্ডল	৭।	শ্রী বৈদ্যনাথ দত্ত	১৩।	শ্রী রামসিংহ পাল
২।	শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারী	৮।	শ্রী সুখদেব দত্ত	১৪।	শ্রী রমেন মৈত্র
৩।	শ্রী অমরেন্দ্রনাথ আদক	৯।	শ্রী অমিয় কুমার গুপ্ত	১৫।	শ্রী ললিত মোহন হাজরা
৪।	শ্রী নন্দলাল দত্ত	১০।	শ্রী অজিত কুমার মাজি	১৬।	শেখ বি. জে. নস্কর
৫।	শ্রী পাঁচকরি পাল	১১।	শেখ আনোয়ার আলি মিদ্যা	১৭।	শেখ গনি মিদ্দ্যা
৬।	শ্রী প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল	১২।	শ্রী শান্তিমোহন রায়	১৮।	শ্রী কাশিনাথ মণ্ডল

তারকেশ্বর-পুরশুড়া সমবায় হিমঘর (১৯৬৩) আমাদের সাধের চাঁপাডাঙা কলেজ প্রতিষ্ঠায় তৎকালীন সময়ে বিশেষ অবদান রেখেছে। তবে শুরুতে প্রথম প্রায় পাঁচ বছর ১৯৭১-১৯৭৬ আমাদের প্রিয় মহাবিদ্যালয় কোনো সরকারি সাহায্য পায়নি। প্রথমে এটি একটি মুচলেকা বা আন্ডারটেকিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ১৪-টি এই রকম মুচলেকা কলেজ ছিল। উক্ত সময়কালে কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ সরকার থেকে কোনো বেতন পেতেন না। কলেজের প্রথম দিকের দুই জন সম্পূর্ণ সময়ের শিক্ষক, কয়েকজন আংশিক সময়ের শিক্ষক ও তিনজন শিক্ষাকর্মী নামমাত্র বেতনে কাজ করতেন। ১৯৭২-৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যলয় কর্তৃক আর্টস বিভাগের অনুমোদন পাওয়ার সময় সরকার পক্ষ থেকে কলেজকে জানিয়ে দেওয়া হয়, আগামী তিন বছর সরকার থেকে কোনোরকম সাহায্য কলেজ পাবে না। তিন বছর পর কলেজ সরকারি অনুদান ও নানা সাহায্য পেতে শুরু করে। তবে ১৯৭৭ সালের জুন থেকে নিয়মিত সরকারি বেতন শুরু হলেও ০১/০১/১৯৭৩ থেকে ডি. এ. দেওয়া হয়েছিল। পার্শ্ববর্তী গ্রামের বাসিন্দা তথা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক শ্রী প্রমোদ মিদ্দার সহায়তায় কলেজের শিক্ষকদের সরকারি ডি. এ. দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরকম আরও বেশ কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা— কলেজের গৃহনির্মাণে সর্বতোভাবে পরিশ্রম দিয়ে সাহায্য করেন শ্রী নন্দলাল দত্ত। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ১৯৭৩ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেছিলেন। তিনি সত্তরের দশকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন মহাবিদ্যালয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায়। বর্তমান ক্যানটিন বিল্ডিং নির্মাণে তদারকি করার জন্য তাঁর অবদান স্মরণযোগ্য। চাঁপাডাঙা ব্যবসায়ীরা আলু বিক্রি করে প্রতি প্যাকেট পিছু কিছু অর্থ কলেজকে দান করতেন। কলেজের ফার্নিচার তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ওল্ড বেনারস রোডের গাছ বিক্রি করে কলেজকে দেওয়া হয়েছিল। হুগলি ট্রেডারস বিল্ডিং এর দ্বিতলে কয়েকজন শিক্ষককে কোনোরকম ভাড়া ছাড়াই থাকতে

দেওয়া হয়েছিল। সদ্যজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির জন্য এরকম অনবদ্য এবং অসামান্য অবদান অনেকেই রেখে গেছেন, তবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে বিষয়ে কোনো দলিল দস্তাবেজ বা নথিপত্র না-থাকায় তাঁদের সকলের অবদানের কাহিনি আজ বিস্মৃতির অন্তরালে চলে গেছে। তবে 'ওরাল হিস্ট্রি' উক্ত বিষয়ে আমাদের বেশ কিছুটা সাহায্য করতে পারে অন্তত এই আশা রাখতে পারি। ১৯৭৪ সালে মাত্র এগারো জন পূর্ণসময়ের শিক্ষককে নিয়ে মহাবিদ্যালয়ের প্রথম টিচার্স কাউন্সিল গঠিত হলে এর প্রথম সেক্রেটারি হন অধ্যাপক শ্রী উপানন্দ রায় (১৯৭১-২০০৮)। নীচে মহাবিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে বেশ কিছু ব্যক্তি বা সংস্থা কর্তৃক স্বেচ্ছায় অর্থদানের একটা তালিকা দেওয়া হল—

ক্রম	নাম	অর্থমূল্যের পরিমাণ
১।	সর্বশ্রী— মনীন্দ্রনাথ রায়	৪০, ২৬০ টাকা
২।	আলু-পাট ব্যবসায়ী সমিতি	২২, ৭৮৩ টাকা
৩।	নিতাই চরণ হাজরা	২০, ০০০ টাকা
৪।	শ্রীমতি ফেলুবালা দাসী	১৯, ৯৯৯ টাকা
৫।	হাইত-মণ্ডল এন্ড কো.	১০, ৯৩৫ টাকা
৬।	কাশিনাথ মণ্ডল	৬, ৬৮৮ টাকা
৭।	পাঁচকড়ি পাল	৬, ৬৭০ টাকা
৮।	নিত্যানন্দ অধিকারী	৫, ৪৯১ টাকা
৯।	তারকেশ্বর এস্টেট	৫, ০০০ টাকা
১০।	পাঁচু গোপাল আশ	৪, ৭০০ টাকা
১১।	প্রসাদ চন্দ্র মণ্ডল	৪, ৫৪০ টাকা
১২।	জগত ভূষণ দত্ত	৩, ৩৩১ টাকা
১৩।	রবীন্দ্র কোল্ড স্টোরেজ	৩, ১০২ টাকা
১৪।	প্রাণ কৃষ্ণ মণ্ডল	২, ৬০০ টাকা
১৫।	পুলিন বিহারী হাজরা	২, ৫৫২ টাকা
১৬।	চাঁপাডাঙা আলুপট্টী বারোয়ারী	২, ৪০০ টাকা
১৭।	রাধারামন দত্ত	২, ৩৫১ টাকা
১৮।	সুবাস চন্দ্র সামন্ত	২, ৩৪১ টাকা
১৯।	ভূতনাথ প্রামাণিক	২, ২৫৩ টাকা
২০।	মুক্তারাম গুছাইত	২, ২৪২ টাকা
২১।	তারকেশ্বর-পুরশুরা কো-অপা. কোল্ড স্টোরেজ	২, ২০৭ টাকা
২২।	রাধেশ্যাম আধিকারী এন্ড কো.	২, ০২০ টাকা
২৩।	অনন্তদেব নায়েক	২, ০০১ টাকা
২৪।	দেশবন্ধু কোল্ড স্টোরেজ	২, ০০০ টাকা
২৫।	অমরেন্দ্রনাথ সামন্ত	১, ৮২৩ টাকা
২৬।	নন্দলাল দত্ত	১, ৬৬৪ টাকা
২৭।	অমরেন্দ্রনাথ আদক	১, ৫৮৭ টাকা

২৮।	পটেটো সিন্ডিকেট	১, ৫০২ টাকা
২৯।	শিবেন কুমার ভৌমিক	১, ৫০০ টাকা
৩০।	ভূদেব চন্দ্র মান্না	১, ৪০০ টাকা
৩১।	চার্মু প্রসাদ যাদব	১, ৩০১ টাকা
৩২।	হীরালাল হাজরা	১, ২৮৭ টাকা
৩৩।	সুখদেব দত্ত	১, ২২০ টাকা
৩৪।	মুখার্জি ব্রাদার্স	১, ২০১ টাকা
৩৫।	সাধন চন্দ কারার এবং কালিপদ কারার	১, ১২২ টাকা
৩৬।	বিষ্ণুপদ হাইত এন্ড সন্স	১, ১২০ টাকা
৩৭।	অমুল্য চন্দ্র সাধুখাঁ এবং গণেশ চন্দ্র সাধুখাঁ	১, ১০১ টাকা
৩৮।	লক্ষ্মী কান্ত বেরা	১, ১০০ টাকা
৩৯।	রাধাশ্যাম সুশীল কুমার	১, ১০০ টাকা
৪০।	নিতাই চন্দ্র বেরা	১, ০৬২ টাকা
৪১।	রুবিয়াল হুসেন মল্লিক	১, ০৫১ টাকা
৪২।	ঊষাপতি জানা	১, ০৫০ টাকা
৪৩।	রাসবিহারি ঘোষ	১, ০১৫ টাকা
৪৪।	চাঁপাডাঙা কোল্ড স্টোরেজ	১, ০০১ টাকা
৪৫।	গুহ এন্ড কো.	১, ০০১ টাকা
৪৬।	কালিকিঙ্কর ঘোষ	১, ০০১ টাকা
৪৭।	পিয়ারলেস জেনারেল ইনস্যুরেন্স কো.	১, ০০১ টাকা
৪৮।	সুরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি	১, ০০১ টাকা
৪৯।	বাগ-মণ্ডল এন্ড কো.	১, ০০১ টাকা
৫০।	শেখ. মো. গনী	১, ০০১ টাকা
৫১।	বিজয় কৃষ্ণ মণ্ডল	১, ০০১ টাকা
৫২।	ধীরেন্দ্রনাথ সামন্ত	১,০০১ টাকা
৫৩।	বিনোদ বিহারী মাজি	১, ০০১ টাকা
৫৪।	বিষ্ণুপদ কুণ্ডু	১, ০০১ টাকা
৫৫।	বলাই চন্দ্র সরকার	১, ০০১ টাকা
৫৬।	কিশোরী মোহন রায়	১, ০০০ টাকা
৫৭।	নির্মল কৃষ্ণ বসু	১, ০০০ টাকা
৫৮।	শ্রীধর চন্দ্র সাধুখাঁ	১, ০০০ টাকা
৫৯।	লক্ষণ চন্দ্র হাজরা এবং হীরালাল হাজরা	১, ০০০ টাকা
৬০।	বিবেকানন্দ সেন	১, ০০০ টাকা
৬১।	বসন্ত কুমার কুণ্ডু	১, ০০০ টাকা
		সর্বমোট = ২২০, ৬৮৪ টাকা
		(দুই লক্ষ কুড়ি হাজার ছ-শো চুরাশি)

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আমাদের দেশে ত্যাগীলোকের দ্বারাই চিরকাল বিদ্যার প্রচার হয়েছে। বেলুড়ের রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহাশয় চাঁপাডাঙা কলেজের প্রথম অধ্যক্ষপদ (অবৈতনিক) অলংকৃত করেন যিনি ইতিপূর্বে দ্বারহাটা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক থাকাকালীন তৎকালীন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের হাত থেকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। যাইহোক শুরুতে রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স এবং বি. কম. পাশ কোর্সের অনুমোদন লাভ করে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাই ১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষে মাত্র নয়জন শিক্ষার্থী প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সে (ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স এক্সাম) এবং আরও প্রায় তেইশ জন শিক্ষার্থী বি.কম. (পাশ) কোর্স প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিল। এই ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স এক্সামের ফাইনাল পরীক্ষায় আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ভরত মেটে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৭২-৭৩ শিক্ষাবর্ষে বি.এ. কোর্স শুরু হয়। অর্থনীতির অধ্যাপক অধ্যক্ষ মহাশয় শ্রী চণ্ডীদাস মুখার্জির (১৯৭৯-১৯৯৯) সময়ে কলেজের যথার্থ অগ্রগতি শুরু হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তাঁর সময়ে জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রধান সড়ক থেকে মহাবিদ্যালয়ে যোগাযোগকারী রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছিল। মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক জরুরি 2 (F) এবং 12 (B) মর্যাদা লাভ (অনুমোদন) করে তাঁর সময়ে। মূলত তাঁর ও মহাবিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী চৈতন্য মহাশয়ের উদ্যোগে যথাক্রমে মহাবিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে মনমুগ্ধকর পুষ্পশোভিত উদ্যান এবং পুষ্করিণীর চতুর্ধারে বৃহৎ বৃক্ষরোপণের মূল কাজ হয়েছিল। ১৯৮০-র দশক থেকে রাজ্য সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউ.জি.সি.) সহ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থসাহায্য আসায় কলেজের প্রধান চত্বরে (ক্যাম্পাসে) পরপর বেশ কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিল্ডিং নির্মাণ হতে লাগল, যথা প্রশাসনিক ভবনের নীচতলা (চারটি কক্ষ), বিজ্ঞানভবনের নীচ তলা, ক্যানটিন, জিমনেশিয়াম বিল্ডিং, গ্রন্থাগার, বায়ো-সায়েন্স বিভাগ এবং সর্বশেষে ছাত্রীনিবাস। তবে এই নির্মাণেরও ইতিহাস আছে। যেমন স্থানসংকুলানের অভাবে শুরুতে অর্থাৎ ১৯৭১ সালে কলেজের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রথমে বর্তমান ১নং কক্ষে ছিল। কয়েক বছর পরে ১৯৭৬-৭৭ সালে তা স্থানান্তরিত করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ১২বি. তে। এরপর তৎকালীন সময়ের দাবি মেনে ১৯৯৮-৯৯ সালে তা বর্তমান বিজ্ঞান ভবনের দ্বিতলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই গ্রন্থাগার বর্তমান ৪৮নং কক্ষের নীচের তলায় (বিদ্যাসাগর ভবনে) স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগার সেখানেই অবস্থিত। প্রথমদিকে অর্থাভাব থাকায় বর্তমান প্রশাসনিক ভবনের একতলায় মাত্র চারটি কক্ষ নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল। ১নং কক্ষের মধ্যেই শ্রেণিবিন্যাস করে অধ্যক্ষ চেম্বার, অফিস রুম, স্টাফ রুম, লাইব্রেরি এবং ক্যানটিন অবস্থিত ছিল। ২নং কক্ষে ইউ. ই. (ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স)-এর ক্লাস হত। বি. কম. ক্লাসের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩নং এবং ৪নং কক্ষ। ধীরে ধীরে সময়ের ব্যবধানে ৬নং এবং ৭নং কক্ষ নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এরপরে দ্বিতলে প্রথমে পশ্চিমদিকের কক্ষগুলি এবং পরে পূর্বদিকের কক্ষগুলির নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকায় এবং উপর্যুপরি মহাবিদ্যালয়ের প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় একবিংশ শতকের সূচনাপর্বে মূলত তৎকালীন অধ্যক্ষ তরুণ কুমার মণ্ডল মহাশয়ের আগ্রহে কলেজ কর্তৃক স্বল্প অর্থের বিনিময়ে কলোনিতে ৩৩৭ শতক জমি ক্রয় করা হয়েছিল। এইভাবে সেদিনের সদ্য প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় ধীরে ধীরে আজ এলাকায় মহীরুহ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বর্তমানে প্রতি বছর গড়ে প্রায় এগারোশো–বারোশো ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষার জন্য এখানে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হচ্ছে। বলে রাখা ভালো কলেজ থেকে একটু দূরত্বে বসবাসকারী ছাত্রীদের জন্য মহাবিদ্যালয় চত্বরে একটি ছাত্রী আবাসের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ২০০৫-২০০৬ সাল নাগাদ এই ছাত্রীনিবাস নির্মাণে তৎকালীন চাঁপাডাঙা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী

এবং অঞ্চলের সুধী ব্যবসায়ীবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রায় ছয়-লক্ষ টাকা চাঁদা মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন। এছাড়া শিক্ষার্থীদের থেকেও প্রায় দুই লক্ষ টাকা চাঁদা গ্রহণ করা হয়েছিল। অধ্যক্ষ তরুণ কুমার মণ্ডলের সময়কালে এই প্রায় আট লক্ষ টাকা আর সঙ্গে কলেজ তহবিল থেকে আরও কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল ৯১ শতক জমি ক্রয় ও ছাত্রীনিবাসের ইমারত নির্মাণে। তাছাড়া তাঁর উদ্যোগে মহাবিদ্যালয়ের মাঠ আরও বিস্তৃত হয়। ফুটবল খেলার উপযোগী পূর্বের নয়জন খেলোয়াড়ের জায়গায় এখন উভয় দলে এগারোজন করে খেলোয়াড় একত্রে খেলায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। উপরে বর্ণিত কলেজের ছাত্রীনিবাস (হোস্টেল) নির্মাণকল্পে সংগৃহীত অনুদানের (কলেজ উন্নয়ন তহবিল) একটা রূপরেখা নীচে দেওয়া হল—

ক্রম	অনুদানকারী সহৃদয় ব্যবসায়ীবৃন্দ	অর্থমূল্য(টাকায়)
১।	নির্মলা প্রিন্টার্স, চাঁপাডাঙা	২,০০০
২।	শোভা ইঞ্জিনিয়ারিং, চাঁপাডাঙা	৩,০০০
৩।	শঙ্কর কুমার হাজরা, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৫,০০০
৪।	পাপিয়া চানাচুর, মুক্তারপুর	১,০০০
৫।	সত্যনারায়ণ লৌহভাণ্ডার, চাঁপাডাঙা	৫,০০০
৬।	শ্রী দুর্গা হার্ডওয়ার্স, চাঁপাডাঙা	১,০০০
৭।	গোপাল বাগ, চাঁপাডাঙা	৫০০
৮।	অরুপ এন্টারপ্রাইজ, চাঁপাডাঙা	২,০০০
৯।	নির্মলা প্রিন্টার্স, চাঁপাডাঙা	৫০০
১০।	রূপচাঁদ পাখিরা, চাঁপাডাঙা	২,০০০
১১।	শ্রীকান্ত মণ্ডল, চাঁপাডাঙা	১,০০০
১২।	আনন্দ কর্মকার, চাঁপাডাঙা	১,০০০
১৩।	মানসী হার্ডওয়ার্স, চাঁপাডাঙা	৩,০০০
১৪।	ড. চিত্তরঞ্জন বেরা, চাঁপাডাঙা	১,০০০
১৫।	শিবনাথ দে, চাঁপাডাঙা	১,৫০০
১৬।	বিদ্যুৎ কুমার মণ্ডল, চাঁপাডাঙা	২,০০০
১৭।	অসিত পাত্র, জঙ্গলপাড়া	২,০০০
১৮।	সুধীর চন্দ্র সাধুখাঁ, চাঁপাডাঙা	১,০০০
১৯।	প্রশান্ত কুমার পাল, চাঁপাডাঙা	২,৫০০
২০।	দিলীপ কুমার সামন্ত, চাঁপাডাঙা	১,০০০
২১।	তরুণ কুমার বসু, চাঁপাডাঙা	১,০০০
২২।	সুশান্ত কুমার সাধুখাঁ, চাঁপাডাঙা	২,০০০
২৩।	তারকনাথ সাধুখাঁ, চাঁপাডাঙা	৫০০
২৪।	পান্নালাল ভগতলাল, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৫০০
২৫।	জনাব নাসিরুদ্দিন মল্লিক, চাঁপাডাঙা	১,০০০
২৬।	অশোক কুমার বটব্যাল, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১০,০০০

২৭।	নন্দ গোপাল বসু, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৩০,০০০
২৮।	পিরুপদ মালিক, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৫,০০০
২৯।	ড. তরুণ কুমার মণ্ডল, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৪০,০০০
৩০।	ড. অসীম কুমার সামন্ত, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৫,০০০
৩১।	মোহিনী মোহন মান্না, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১০,০০০
৩২।	মৃণাল কান্তি বেরা, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১,২০০
৩৩।	অশোক কুমার বটব্যাল, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১০০,০০০
৩৪।	উমা বিজয়স মিল, চাঁপাডাঙা	৫,০০০
৩৫।	অধ্যাপক অনিন্দ্য কুমার মল্লিক, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১০,০০০
৩৬।	অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১০,০০০
৩৭।	চণ্ডীচরণ বেরা, চাঁপাডাঙা	১০,০০০
৩৮।	মনোরঞ্জন দাস, চাঁপাডাঙা	১,০০০
৩৯।	সুভাষ সাধুখাঁ, চাঁপাডাঙা	
১,০০০		
৪০।	হারাধন সামন্ত, চাঁপাডাঙা	৫,০০০
৪১।	আশিস মণ্ডল, পশ্চিম রামনগর	১,০০০
৪২।	বাপ্পাদিত্য কর্মকার, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৫,০০০
৪৩।	অধ্যাপক নির্মল চক্রবর্তী, রামমোহন কলেজ (খানাকুল)	১,৫০০
৪৪।	অধ্যাপক উদয়চাঁদ রানা, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১০,০০০
৪৫।	সুনীল কুমার দাস, পুরশুড়া	১০০,০০০
৪৬।	শেখ ইউসুফ আলি, চাঁপাডাঙা	১,০০০
৪৭।	অনুপ পাত্র, ক্ষুদিরামপুর	২,০০০
৪৮।	সৌমেন বিশ্বাস, চাঁপাডাঙা	৫,০০০
৪৯।	মলয়কুমার মান্না, বিনগ্রাম	২,০০০
৫০।	অধ্যাপক দুলালচন্দ্র মাল, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৫,০০০
৫১।	শঙ্কর কুমার হাজরা, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৫,০০০
৫২।	গন্ধেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, চাঁপাডাঙা	২,০০০
৫৩।	দিবাকর ঘোষ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১,০০০
৫৪।	অধ্যাপক অশোক কুমার বটব্যাল, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৮০,০০০
৫৫।	আশিস কুমার পোড়েল, চাঁপাডাঙা	৫০০
৫৬।	সুলেখা পাণ্ডে, জায়ের	১,০০০
৫৭।	অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	৪০,০০০
৫৮।	সচ্চিদানন্দ রায়, বর্ধমান	২,০০০
৫৯।	হরিসাধন মণ্ডল, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১,০০০
৬০।	পিন্টু দে, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১,০০০

৬১।	সন্দীপ শেঠ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১,০০০
৬২।	অধ্যাপক উপানন্দ রায়, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়	১০,০০০
		সর্বমোট অর্থমূল্য= ৫৬৩,২০০ (পাঁচ লক্ষ তেষট্টি হাজার দুশো)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাণিজ্য বিভাগ দিয়ে কলেজে শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হয়েছিল। এরপরে ধীরে ধীরে সময়ের দাবি মেনে অন্যান্য বিভাগগুলিও অনুমোদন পায় এবং শিক্ষার্থী ভর্তি হতে থাকে। মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সময়ে অধ্যাপকরা ছিলেন সবই আংশিক সময়ের। কলেজ প্রতিষ্ঠার বছরেই বাণিজ্য বিভাগে রণজিৎ গোস্বামী এবং শিবনাথ দে, বাংলায় নিশীথ মুখার্জি, ইংরেজি সাহিত্যে অসিত ঘোষাল, রামসিংহ পাল, কমার্শিয়াল ম্যাথে চণ্ডী বেরা, অর্থনীতিতে রামেশ্বর সিংহ রায় যোগ দেন। কিছুদিন পরে মহাবিদ্যালয়ে বেশ কয়েকটি পদে পূর্ণসময়ের স্থায়ী শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় যথা; বাণিজ্য বিভাগে শ্রী উপানন্দ রায় (১৯/০২/১৯৭২) ও শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ সরকার (২১/০২/১৯৭২) যোগ দেন। পরের বছর কলা বিভাগ চালু হলে পূর্ণসময়ের স্থায়ীশিক্ষক পদে বাংলা বিভাগে শ্রী নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায়, ইতিহাস বিভাগে শ্রী প্রদীপ কুমার পাল, ইংরেজি বিভাগে শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস, অর্থনীতি বিভাগে শ্রী মোহিনী মোহন মান্না এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শন বিভাগে যথাক্রমে শ্রী নির্মল চন্দ্র দাস ও শ্রী ফাল্গুনী গুপ্ত মজুমদার মহাশয়কে নিযুক্ত করা হয়। আংশিক সময়ের শিক্ষক হিসেবে ইংরেজি বিভাগে শ্রী শ্যামসুন্দর হাজরা এবং শ্রী বিশ্বনাথ হাজরা, দর্শন বিভাগে শ্রী রথীন হাজরা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শ্রী প্রশান্ত ঘোষ, ইতিহাস বিভাগে শ্রী সুনীল বসু, কমার্শিয়াল ল-তে শ্রী নিরাপদ মণ্ডল এবং ভূগোল বিভাগে শ্রী পরমার্থ ঘোষ যোগদান করেন। সময়ের দাবি মেনে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক হিসেবে বাংলায় শ্রী দেশপ্রিয় বসু, ইংরেজিতে শ্রী অশোক বটব্যাল, অর্থনীতি বিভাগে শ্রী অনিন্দ্য কুমার মল্লিক, দর্শন বিভাগে শ্রী লক্ষ্মী পাল, বাংলায় শ্রীমতী রমা আদক এবং সংস্কৃত বিভাগে শ্রী উদয় চাঁদ রানা ও শ্রী চণ্ডীচরণ চ্যাটার্জির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও শ্রী তড়িৎ কুমার রায়ের নাম সেই প্রথম যুগের অধ্যাপক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। মহাবিদ্যালয়ের প্রথমযুগের এন.এস.এস. অফিসাররা ছিলেন অধ্যাপক লক্ষ্মীকান্ত পাল, অধ্যাপক উদয় চাঁদ রানা, অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন দাস এবং অধ্যাপক দেবপ্রসন্ন বিশ্বাস। প্রথমযুগের এন.সি.সি. অফিসাররা ছিলেন অধ্যাপক নবকুমার ঘোষ এবং অধ্যাপক জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। ধীরে ধীরে মহাবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাবৃদ্ধি ও আধুনিকতার সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পিওর সায়েন্স এবং বায়ো সায়েন্স প্রভৃতি বিভাগগুলির অনুমোদন দেওয়া হতে থাকে। সত্তরের অন্তিমলগ্ন থেকে সমগ্র আশির দশক ও নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগ পর্যন্ত একদিকে যেমন নতুন নতুন বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি হতে থাকে তেমনি পূর্ণ ও আংশিক সময়ের শিক্ষক নিয়োগ অব্যাহত থাকে। শ্রী অর্ধেন্দু শেখর জানা, শ্রী সুপ্রকাশ সরকার, শ্রী মোহিনী মোহন মান্না, বিশ্বজিৎ জানা, শ্রী সুকৃতি ঘোষাল, শ্রী অসীম কুমার দে, শ্রীমতী ইতি মুখার্জি, শ্রী অমল হাটী, শ্রী নিরাপদ মণ্ডল, শ্রীনারাণ চন্দ্র সাহা, শ্রী বিশ্বজিত জানা, শ্রী সৌরেশ পাত্র, শ্রী শ্যামলাল সুকুল, শ্রীদুলাল চন্দ্র মাল, শ্রী মলয়েন্দু মাইতি, শ্রী মিহির রঞ্জন ঘোষ, শ্রী দীপক চক্রবর্তী, শ্রী গৌতম চৌধুরী, শ্রী স্বপন দত্ত, শ্রী হরিদেব শীল, শ্রী দেবনাথ মুখার্জি, শ্রী নন্দ গোপাল বসু, শ্রী নবকুমার ঘোষ, শ্রী দেবপ্রসন্ন বিশ্বাস, শ্রীমতী সুমিতা জোয়ারদার, শ্রী অসীম কুমার সামন্ত, শ্রীমতি রমা দত্ত, শ্রী মলয় ঘোষ, শ্রী সৌমেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি, শ্রী ভাস্কর সান্যাল, শ্রী ধ্রুবজ্যোতি

চন্দ্র, শ্রী রাজা চৌধুরী, শ্রী সুমিত মিত্র, মোসারফ হোসেন, শ্রী জ্যোতির্ময় দাস, শ্রী সুশান্ত মাজি, শ্রী তন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীমতি সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ স্বনামধন্য অধ্যাপক ক্রমে ক্রমে মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করেন। একবিংশ শতকের প্রথম দশকের শুরু থেকে স্থায়ী ও অস্থায়ী পদে যথাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন এবং মহাবিদ্যালয়ের পরিচালনমণ্ডলী দ্বারা অধ্যাপকপদে নিয়োগ অব্যাহত আছে।

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে বর্তমানে ১৯-টি বিভাগ আছে। এর মধ্যে ষোলোটি বিভাগে অনার্সের এবং তিনটি বিভাগে শুধুমাত্র জেনারেল পাঠক্রমের পড়াশোনা চালু রয়েছে। উক্ত ষোলোটি অনার্সের অনেক বিভাগে জেনারেল পাঠক্রমের পড়াশোনাও চালু রয়েছে। একথা বলাবাহুল্যই যে, সব বিভাগগুলি এক সাথে শুরু হয়নি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এই বিভাগগুলি একে একে তার পথ চলা শুরু করে।

ক্রম	বিভাগ	সময়	
		জেনারেল	অনার্স
১।	বাণিজ্য	১৯৭১	১৯৭৯
২।	অর্থনীতি	১৯৭২	১৯৮৫
৩।	ইংরেজি	১৯৭২-৭৩	১৯৮৫-১৯৮৬
৪।	বাংলা	১৯৭২-৭৩	১৯৯৫-১৯৯৬
৫।	ইতিহাস	১৯৭২-৭৩	১৯৯৮-১৯৯৯
৬।	দর্শন	১৯৭২-৭৩	১৯৯৮-১৯৯৯
৭।	সংস্কৃত	১৯৭২	২০০৪
৮।	রাষ্ট্রবিজ্ঞান	১৯৭২	২০০৪-২০০৫
৯।	* পদার্থবিদ্যা	১৯৮০-১৯৮১	১৯৯০
১০।	রসায়ন	১৯৮০	১৯৯৬
১১।	গণিত	১৯৮০	২০১২
১২।	** প্রাণীবিদ্যা	১৯৮৪-৮৫	১৯৯৬-১৯৯৭
১৩।	উদ্ভিদবিদ্যা	১৯৮৪	১৯৯৮
১৪।	প্রতিরক্ষা	১৯৯৬-৯৭	-------
১৫।	ভূগোল	১৯৯৬-৯৭	২০০৫
১৬।	শারীর শিক্ষা	১৯৯৭-৯৮	-------
১৭।	*** মাইক্রোবায়োলজি	----	২০০২
১৮।	রাশিবিজ্ঞান	২০০৩	------
১৯।	শিক্ষাবিজ্ঞান	২০০৫	২০০৭

* ১৯৮০ এর একেবারে শেষ লগ্নে পদার্থবিদ্যাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হলে ১৯৮১ সালে এই বিভাগে উচ্চমাধমিক এর শিক্ষার্থী ভর্তির সঙ্গে বি. এস. সি. জেনারেল কোর্সেও কিছু শিক্ষার্থী ভর্তি হয়।

** ১৯৮৪-৮৫ সালে উচ্চমাধ্যমিকও শুরু হয়।

*** প্রথমে এটি সেলফ ফাইনান্স কোর্স ছিল। তবে ২০১০ থেকে তা পরিবর্তিত হয়ে অন্য বিভাগগুলির মতো একটি বিভাগে রূপান্তরিত হয়।

কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে শিক্ষাকর্মী ছিলেন শ্রী বটকৃষ্ণ খাঁ, শ্রী সুদাম বেরা, শ্রী গোবিন্দ দাস এবং শ্রী রোহিণী ধাওয়া (চাপরাসি) প্রমুখ। পরবর্তীকালে প্রয়োজনানুসারে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছিল যথ: শ্রী প্রেমচাঁদ কোলে (হিসাবরক্ষক), শ্রী মানিক চন্দ্র মান্না (কোষাধ্যক্ষ), শ্রী দুলাল মাইতি (গ্রন্থাগারিক), শ্রী প্রভাত রঞ্জন গুপ্ত (টাইপিস্ট), শ্রী রবীন চক্রবর্তী (ক্লার্ক) এবং শ্রী শঙ্কর কুমার হাজরা যিনি পরে গ্রন্থাগারিক হন। এছাড়া শ্রী অশোক মুখার্জি, শ্রী তারকদাস ব্যানার্জী (ল্যাবরেটরি সহায়ক), শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র কোলে (ল্যাবরেটরি উপদেষ্টা), শ্রী মানিকলাল মণ্ডল (ল্যাবরেটরি উপদেষ্টা), শ্রী সুশান্ত কুমার মান্না (ল্যাবরেটরি উপদেষ্টা), শ্রী পুরাণ বাহাদুর (নৈশ পাহারাদার), শ্রী অজিত গাঙ্গুলি, শ্রী অজিত কর্মকার, শ্রী অজিত হাজরা, শ্রী রতিকান্ত পন্ডিত, মির্জা মোঃ কাসেম আলি, শ্রীমতী শেফালী অধিকারী (ঝাড়ুদার), শ্রী জানকী ভগতলাল (ঝাড়ুদার) এবং শ্রী রাধাকান্ত মৈত্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও শ্রী অশোক কুমার মাইতি, শ্রী বিপুল চন্দ্র মাজি, শ্রী বনবিহারী দত্ত বণিক, শ্রীমতী জয়শ্রী বেরা, শ্রীমতি সোমা রায় (মহিলা তত্ত্বাবধায়ক), শ্রী পঞ্চানন মাজি (দারোয়ান) প্রমুখদের নিয়োগ করা হয়।

১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে প্রস্তুতি কমিটির সভায় ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহাশয়কে কলেজের প্রথম পূর্ণসময়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও রদবদল আসে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আদেশবলে কলেজে পরিচালন সমিতি গঠিত হয়। ১৯/১১/১৯৭৩ তারিখে এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমিতির সম্পাদক ও সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক মহাশয় এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রী প্রসাদ চন্দ্র মণ্ডল মহাশয়। উক্ত সমিতির সদস্যবৃন্দ হিসেবে মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় ছাড়াও ছিলেন শ্রী অসিত বরণ হাজরা (শ্রী নিতাই চন্দ্র হাজরা মহাশয়ের আত্মীয়), শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ সরকার, শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস এবং ড. তাপস চৌধুরী (বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য)। যে-কোনো প্রতিষ্ঠান গঠন ও উন্নয়নে সেই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পদাধিকারীর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। নিম্নে এই মহাবিদ্যালয়ের মাননীয়/মাননীয়া অধ্যক্ষ ও টিচার-ইন-চার্জদের নাম ও সময়কাল দেওয়া হল যারা বিগত পাঁচ দশকে রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের নানা ওঠাপড়া ও টানাপোড়েনের সাক্ষী।

ক্রম	নাম	পদ	সময়কাল
১।	অধ্যাপক রণজিৎ কুমার সামন্ত	টিচার-ইন-চার্জ	০৮-১১-১৯৭১ থেকে ৩০-১১-১৯৭১
২।	অধ্যাপক অসিত কুমার ঘোষাল	টিচার-ইন-চার্জ	০১-১২-১৯৭১ থেকে ৩১-১২-১৯৭২
৩।	অধ্যাপক শৈলেন্দ্র নাথ সরকার	টিচার-ইন-চার্জ	০১-০১-১৯৭৩ থেকে ৩১-০১-১৯৭৩
৪।	ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য	অধ্যক্ষ	০১-০২-১৯৭৩ থেকে ১৭-০৩-১৯৭৮
৫।	অধ্যাপক শৈলেন্দ্র নাথ সরকার	টিচার-ইন-চার্জ	১৮-০৩-১৯৭৮থেকে ৩১-০৮-১৯৭৮
৬।	অধ্যাপক উপানন্দ রায়	টিচার-ইন-চার্জ	০১-০৯-১৯৭৮ থেকে ০৭-০১-১৯৭৯
৭।	অধ্যাপক নীহার রঞ্জন আচার্য	অধ্যক্ষ	০৮-০১-১৯৭৯ থেকে ২২-০৬-১৯৭৯
৮।	অধ্যাপক উপানন্দ রায়	টিচার-ইন-চার্জ	২৩-০৬-১৯৭৯ থেকে ২৯-১০-১৯৭৯
৯।	অধ্যাপক চণ্ডীদাস মুখার্জি	অধ্যক্ষ	৩০-১০-১৯৭৯ থেকে ৩১-০৫-১৯৯৯
১০	অধ্যাপক উপানন্দ রায়	টিচার-ইন-চার্জ	০১-০৬-১৯৯৯ থেকে ২২-১২-১৯৯৯
১১।	ড. তরুণ কুমার মণ্ডল	অধ্যক্ষ	২৩-১২-১৯৯৯ থেকে ২৩-০২-২০০৯

১২।	ড. ফাল্গুনী গুপ্ত মজুমদার	টিচার-ইন-চার্জ	২৪-০২-২০০৯ থেকে ০১-১১-২০০৯
১৩।	অধ্যাপক উদয় চাঁদ রানা	টিচার-ইন-চার্জ	০২-১১-২০০৯ থেকে ৩১-০১-২০১০
১৪।	ড. তরুণ কুমার মণ্ডল	অধ্যক্ষ	০১-০২-২০১০ থেকে ৩১-১০-২০১৩
১৫।	অধ্যাপিকা সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়	টিচার-ইন-চার্জ	০১-১১-২০১৩ থেকে ৩১-০৭-২০১৫
১৬।	ড. মানস কুমার জানা	অধ্যক্ষ	০১-০৮-২০১৫ থেকে ১১-০১-২০১৬
১৭।	অধ্যাপিকা সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়	টিচার-ইন-চার্জ	১২-০১-২০১৬ থেকে ৩১-০৮-২০১৮
১৮।	ড. প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য	অধ্যক্ষ	০১-০৯-২০১৮ থেকে বর্তমান

দীর্ঘ পাঁচ দশকে রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সভাপতির (প্রেসিডেন্ট) পদে যাঁরা ছিলেন তাঁদের নাম-পরিচয়ের তালিকা নিম্নরূপ—

ক্রম	নাম	সময়কাল
১।	শ্রী প্রসাদ চন্দ্র মণ্ডল	০৫/১১/১৯৭১-১৮/১১/১৯৭৩ (প্রস্তুতি কমিটি)* ১৯/১১/১৯৭৩-০৪/০৯/১৯৭৬ (কলেজের পরিচালন সমিতি)**
২।	শ্রী মনীন্দ্র নাথ রায়	০৫/০৯/১৯৭৬-২৯/১২/১৯৭৯
৩।	শ্রী প্রসাদ চন্দ্র মণ্ডল	৩০/১২/১৯৭৯-২৯/০৭/১৯৮৪
৪।	শ্রী অশকেন্দু রায়	৩০/০৭/১৯৮৪-১৮/০৩/১৯৯১
৫।	শ্রী বিষ্ণুপদ বেরা	১৯/০৩/১৯৯১-২৯/০৮/২০০০
৬।	শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র সামন্ত	৩০/০৮/২০০০-২৯/০৯/২০০৩
৭।	শ্রী অসিত পাত্র	৩০/০৯/২০০৩-০২/০৯/২০১০
৮।	শ্রী হরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি	০৩/০৯/২০১০-৩০/০৪/২০১১
৯।	শেখ পারভেজ রহমান	০১/১১/২০১১-০২/১২/২০১৩
১০।	শ্রী রচপাল সিং	০৩/১২/২০১৩-০৮/০৭/২০২১ (আমৃত্যু)
১১।	শ্রী রামেন্দু সিংহরায়	১২/১১/২০২১-এখনও পর্যন্ত বর্তমান

বিগত পাঁচ দশকে রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় সম্পাদকবৃন্দের (সেক্রেটারি) নাম ও সময়কাল নিম্নে উল্লেখ করা হল— *০৫/১১/১৯৭১ সালে একটি সভায় প্রস্তুতি কমিটি তৈরি করা হয়। অর্থাৎ সরকারিভাবে ৮/১১/১৯৭১ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তিন দিন আগেই প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এর সময়কাল ছিল প্রায় দুই বছর (০৫/১১/১৯৭১ থেকে ১৮/১১/১৯৭৩)। **১৯/১১/১৯৭৩ সালে কলেজের পরিচালন সমিতি গঠন করা হলে প্রস্তুতি কমিটির পূর্বতন সেক্রেটারি অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক মহাশয়কেই পুনরায় সদ্য গঠিত কলেজের পরিচালন সমিতির সেক্রেটারি করা হয়।

ক্রম	নাম	সময়কাল
১।	অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক	০৫/১১/১৯৭১-১৮/১১/১৯৭৩ (প্রস্তুতি কমিটি)* ১৯/১১/১৯৭৩-১৭/০৩/১৯৭৮ (কলেজের পরিচালন সমিতি)**
২।	অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ সরকার	১৮/০৩/১৯৭৮-৩১/০৮/১৯৭৮
৩।	অধ্যাপক উপানন্দ রায়	০১/০৯/১৯৭৮-০৭/০১/১৯৭৯
৪।	অধ্যাপক নীহার রঞ্জন আচার্য	০৮/০১/১৯৭৯-২২/০৬/১৯৭৯
৫।	অধ্যাপক উপানন্দ রায়	২৩/০৬/১৯৭৯-২৯/১০/১৯৭৯
৬।	অধ্যাপক চণ্ডীদাস মুখার্জি	৩০/১০/১৯৭৯-৩১/০৫/১৯৯৯
৭।	অধ্যাপক উপানন্দ রায়	০১/০৬/১৯৯৯-২২/১২/১৯৯৯
৮।	অধ্যাপক তরুণ কুমার মণ্ডল	২৩/১২/১৯৯৯-২৩/০২/২০০৯
৯।	অধ্যাপক ফাল্গুনী গুপ্ত মজুমদার	২৪/০২/২০০৯-৩১/০১/২০১০
১০।	অধ্যাপক তরুণ কুমার মণ্ডল	০১/০২/২০১০-৩১/১০/২০১৩
১১।	অধ্যাপক সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়	০১/১১/২০১৩-৩১/০৭/২০১৫
১২।	অধ্যাপক মানস কুমার জানা	০১/০৮/২০১৫-১১/০১/২০১৬
১৩।	অধ্যাপক সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়	১২/০১/২০১৬-৩১/০৮/২০১৮
১৪।	অধ্যাপক প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য	০১/০৯/২০১৮-বর্তমান

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে বিগত পাঁচ দশকে যাঁরা অফিসের বড়োবাবুর (হেড ক্লার্ক) গুরুদায়িত্ব সামলেছেন তাঁদের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল—

ক্রম	প্রধান করণিক (বড়োবাবু)
১।	শ্রী বটকৃষ্ণ খাঁ
২।	শ্রী প্রেমচাঁদ কোলে
৩।	শ্রী রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৪।	শ্রী অশোক মুখার্জি
৫।	শ্রী অশোক মাইতি
৬।	শ্রী বনবিহারী দত্ত বণিক
৭।	শ্রী বিনয় কুমার সাধুখাঁ (ভারপ্রাপ্ত)

২০০৫ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষ তরুণ কুমার মণ্ডল মহাশয়ের সময়ে আমাদের রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় প্রথম ন্যাক কর্তৃক মূল্যায়িত হয়। এতে মহাবিদ্যালয় 'বি' গ্রেড অর্জন করে। ২০১৬-১৭ সালে তৎকালীন টি.আই.সি. পদে আসীন অধ্যাপিকা সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে কলেজের দ্বিতীয় ন্যাক মূল্যায়ন হয়। তাঁদের মূল্যায়নে দ্বিতীয়বারে মহাবিদ্যালয় 'বি ডবল প্লাস' গ্রেড পায়। ১৯৭৮ সালে কলেজে একটি সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮ সালে এর সদস্য ছিলেন মাত্র চারজন (০৪)। এঁরা ছিলেন অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ সরকার, অধ্যাপক উপানন্দ রায়, অধ্যাপক নিশীথ কুমার মুখার্জি এবং

অধ্যাপক মোহিনী মোহন মান্না। ৩ অক্টোবর নতুন একত্রিশ (৩১) জন সদস্য এতে যোগ দেওয়ায় সমবায়ের সদস্যসংখ্যা দাড়ায় পঁয়ত্রিশ (৩৫) জন। ১৯৭৯ সালে আরও দুই জন (০২) সদস্য এতে যোগ দেন। এই চাঁপাডাঙা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় স্টাফ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর রেজিস্ট্রেশন নম্বর সেভেন.এইচ.জি. তারিখ ২৮/০২/১৯৭৯। এইভাবে ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৩ ও ১৯৮৪, ১৯৮৫, ১৯৮৬ এবং ১৯৮৭ সালে যথাক্রমে আটজন (০৮), চারজন (০৪), দুইজন (০২) করে, চারজন (০৪), তিনজন (০৩) এবং পাঁচজন (০৫) নতুন সদস্য এতে যোগ দেন। এরপরে ১৯৯২ সালে আরও দুইজন (০২), ১৯৯৩, ১৯৯৪ ও ১৯৯৭ সালে একজন (০১) করে নতুন সদস্য যোগ দেন। ১৯৯৯ সালে নতুন করে আরও দশজন (১০) সদস্য এতে যোগ দেন। ৩১/০৩/২০০০ এবং ৩১/০৩/২০০৩ সালের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী এর সদস্য ছিলেন যথাক্রমে ৬৯ এবং ৭৪ জন। ৩১/০৩/২০০৮, ৩১/০৩/২০০৯ এবং ৩১/০৩/২০১০ সালের অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী এর সর্বমোট সদস্য ছিলেন যথাক্রমে তেষট্টি (৬৩), পঁয়ষট্টি (৬৫) এবং চৌষট্টি (৬৪) জন। এর বর্তমান অর্থাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ সাল পর্যন্ত সর্বমোট সদস্যসংখ্যা সাতাত্তর (৭৭) জন। সদস্যরা বিভিন্ন প্রয়োজনে এই সমিতি থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেন। প্রতি বছর সোসাইটির অডিট রিপোর্ট করা হয়।

যাইহোক খেলাধুলায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের সুখ্যাতির দিকটি জানা না হলে এর পাঁচ দশকের ইতিহাস রচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ জেলা, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও প্রদর্শন যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক এবং আশাপ্রদ।

ক্রম	প্রতিযোগিতা	অর্জন	আয়োজক	সাল
১।	আন্তঃকলেজ আমন্ত্রিত ফুটবল প্রতিযোগিতা (পুরুষ) ০৩/১১/২০০৩ থেকে ১৫/১১/২০০৩	চ্যাম্পিয়ন	এ. কে. পি. সি. কলেজ, বেঙ্গায়, হুগলি স্থান—বেঙ্গাই	২০০৩
২।	আন্তঃকলেজীয় বার্ষিক অ্যথলেটিকস মিট ২৩/১১/২০০৪ থেকে ২৪/১১/২০০৪	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা)	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থান—বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ, বর্ধমান	২০০৪
৩।	আন্তঃকলেজ আমন্ত্রিত ফুটবল প্রতিযোগিতা (পুরুষ) ২৪/০৯/২০০৫ থেকে ১৬/১০/২০০৫	চ্যাম্পিয়ন	শ্রীরামপুর কলেজ, হুগলি	২০০৫
৪।	আন্তঃকলেজ ফুটবল (পুরুষ) টুর্নামেন্ট	চ্যাম্পিয়ন	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থান—বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ, বর্ধমান	২০০৫-৬

ক্রম	প্রতিযোগিতা	অর্জন	আয়োজক	সাল
৫।	৭তম আন্তঃবেসরকারি কলেজ জেলা অ্যাথলেটিকস মিট এবং ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ০৫/০৩/২০০৬ থেকে ১১/০৩/২০০৬	একজন মহিলা অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন হয়। ফুটবল চ্যাম্পিয়ন	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থান— খলিশানি মহাবিদ্যালয়, হুগলি	২০০৬
৬।	৭তম আন্তঃবেসরকারি কলেজ স্টেট ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০/০৩/২০০৬ থেকে ২৫/০৩/২০০৬	চ্যাম্পিয়ন	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থান— যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং এস. এ. আই. কমপ্লেক্স, কলকাতা	২০০৬
৭।	আন্তঃকলেজীয় বার্ষিক অ্যাথলেটিকস মিট ২০/১১/২০০৭ এবং ২১/১১/২০০৭	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ)	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থান— বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ, বর্ধমান	২০০৮
৮।	আন্তঃকলেজীয় বার্ষিক অ্যাথলেটিকস মিট ২০/১১/২০০৮ এবং ২১/১১/২০০৮	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ)	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থান— বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ, বর্ধমান	২০০৮
৯।	দশম আন্তঃবেসরকারি কলেজ জেলা অ্যাথলেটিকস মিট ২৭/০১/২০০৯	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ) একজন মহিলা অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়ন হয়।	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থান— তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ, হুগলি	২০০৯
১০।	আন্তঃকলেজ হ্যান্ডবল টুর্নামেন্ট ২৪/০২/২০০৯	চ্যাম্পিয়ন	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, স্থান— বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ, বর্ধমান	২০০৮-২০০৯
১১।	আন্তঃকলেজীয় বার্ষিক অ্যাথলেটিকস মিট ১৬/১১/২০০৯ এবং ১৭/১১/২০০৯	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ)	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, স্থান— বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ, বর্ধমান	২০০৯
১২।	এগারতম আন্তঃবেসরকারি কলেজ জেলা ফুটবল এবং অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ৮/২/২০১০ থেকে ১৩/০২/২০১০	চ্যাম্পিয়ন গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা)	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থান— খলিশানি মহাবিদ্যালয়	২০১০
১৩।	আন্তঃকলেজীয় বার্ষিক অ্যাথলেটিকস মিট ২০১০ ০৯/১১/২০১০ ও ১০/১১/২০১০	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ)	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থান— মোহনবাগান মাঠ, বর্ধমান	২০১০
১৪।	১২তম ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১১ (১৪/০২/২০১১ থেকে ১৮/০২/২০১১)	চ্যাম্পিয়ন	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, হুগলি	২০১১

ক্রম	প্রতিযোগিতা	অর্জন	আয়োজক	সাল
১৫।	আন্তঃকলেজীয় বার্ষিক অ্যথলেটিকস মিট ২০১১ ৮/১১/২০১১ এবং ৯/১১/২০১১	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ)	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থান—মোহনবাগান মাঠ, বর্ধমান	২০১১
১৬।	১৩তম বেসরকারি কলেজ জেলা অ্যথলেটিকস মিট ২০১২	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ) ২৪/০২/২০১২	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থান—বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হুগলি	২০১২
১৭।	আন্তঃকলেজ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২২/০৮/২০১২ থেকে ২৫/০৯/২০১২	চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ)	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থান—মোহনবাগান মাঠ, বর্ধমান	২০১২
১৮।	আন্তঃকলেজীয় বার্ষিক অ্যথলেটিকস মিট ২০১২	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ) ২১/১১/২০১২ ২২/১১/২০১২	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থান—মোহনবাগান মাঠ, বর্ধমান	২০১২
১৯।	আন্তঃকলেজীয় বার্ষিক অ্যথলেটিকস মিট ২০১৩	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ) ৩/১২/২০১৩ ৪/১২/২০১৩	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থান—মোহনবাগান মাঠ, বর্ধমান	২০১৩
২০।	চতুর্দশ হুগলি জেলা আন্তঃকলেজীয় অ্যথলেটিকস এবং ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৩	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ) ০৯/০২/২০১৩ ফুটবল চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ)	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থান—রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, হুগলি	২০১৩
২১।	হুগলি জেলা আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০১৪ (২৪/০২/২০১৪ থেকে ২৭/০২/২০১৪)	চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ)	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থান—শরৎ সেন্টেনারি কলেজ, হুগলি	২০১৪
২২।	হুগলি জেলা আন্তঃকলেজ অ্যথলেটিকস মিট এবং ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ২০১৪ (২২/০২/২০১৪ ও ২৪/০২/২০১৪)	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ) ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন (মহিলা)	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থান—শরৎ সেন্টেনারি কলেজ, হুগলি	২০১৪
২৩।	আন্তঃকলেজীয় অ্যথলেটিকস মিট ২০১৪	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ) ২৬/১১/২০১৪ ২৭/১১/২০১৪	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থান—মোহনবাগান মাঠ, বর্ধমান	২০১৪

ক্রম	প্রতিযোগিতা	অর্জন	আয়োজক	সাল
২৪।	হুগলি জেলা আন্তঃকলেজীয় অ্যাথলেটিকস, ফুটবল ও ব্যাডমিন্টন মিট ২০১৫	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ) ফুটবল চ্যাম্পিয়ন (পুরুষ) ২৭/০২/২০১৫-২৯/০২/২০১৫ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থান—রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, হুগলি	২০১৫
২৫।	আন্তঃকলেজ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১৫ ০৭/০৪/২০১৫ থেকে ২০/০৪/২০১৫	চ্যাম্পিয়ন	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, স্থান—মোহনবাগান মাঠ, বর্ধমান	২০১৫
২৬।	আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট (ইস্টজোন) (রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় থেকে ছয়জন খেলোয়াড় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দলে অংশগ্রহণ করে)	চ্যাম্পিয়ন	স্থান—এম. জি. কাশী. বিদ্যাপীঠ	২০১৬
২৭।	হুগলি জেলা আন্তঃকলেজীয় অ্যাথলেটিকস মিট ও ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৬	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) ০৫/০২/২০১৬ ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) ১০/০২/২০১৬	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থান—তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ, হুগলি	২০১৬
২৮।	আন্তঃকলেজীয় বার্ষিক অ্যাথলেটিকস মিট ২০১৬	গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) ০৫/১২/২০১৬ থেকে ০৬/১২/২০১৬	স্পোর্টস বোর্ড, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, স্থান—মোহনবাগান মাঠ, বর্ধমান	২০১৬
২৯।	হুগলি জেলা আন্তঃকলেজীয় স্পোর্টস এবং গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭	ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) ২০/০১/২০১৭ অ্যাথলেটিকস গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন (মহিলা) ২৪/০১/২০১৭	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থান—রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, হুগলি	২০১৭
৩০।	৩৩তম ইস্ট জোন জুনিয়র অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ১০-১২ সেপ্টেম্বর ২০২২	প্রথম স্থান সায়ন চ্যাটার্জি (অনূর্ধ্ব-২০ ডিসকাস থ্রো)	এ. এ. এফ. আই., পাটলিপুত্র স্পোর্টস কমপ্লেক্স, পাটনা, বিহার	২০২২
৩১।	আন্তঃকলেজ স্টেট স্পোর্টস এবং গেমস চ্যাম্পিয়নশিপ, ২০২২-২৩	হুগলি ডিস্ট্রিক চ্যাম্পিয়ন	এডুকেশন ডিরেক্টরেট, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, স্থান—ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজ, কলকাতা	২০২৩

আমাদের মহাবিদ্যালয়ের বেশ কিছু পত্রিকা যথা *পথিকৃৎ*, *চরৈবেতি* আর *প্রভাতী* উল্লেখযোগ্য। এগুলোর মধ্যে প্রভাতী ছিল একান্তভাবে শিক্ষাবিভাগের পত্রিকা। এখানকার বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী কৃষক পরিবার থেকে আসা যাঁদের অনেকেই তাদের বংশের প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। কলেজে কেরিয়ার কাউন্সেলিং সেল, স্মার্ট ডিজিটাল ক্লাসরুম, মহিলা সেল, র‍্যাগিং সেল, কম্পিউটার পরিচালিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি রয়েছে। ২০২১ সাল এই সুযোগ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ (১৯৭১-২০২১)।

করোনা মহামারির প্রকোপে ২০২১ সালে তা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি তবে বিলম্বিত হলেও ২০২২ সালের নভেম্বরে (৮-১১-ই) তা সাড়ম্বরে পালিত হয়েছে। উক্ত চারদিনব্যাপী বেশ কয়েকটি সাফল্যমণ্ডিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তী মহোৎসব সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে সমাপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন এমন বেশ কয়েকজন অধ্যাপক পরবর্তীকালে অন্যান্য কলেজে বা এই কলেজেই অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। এছাড়া এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন আর পরবর্তীকালে অন্য কলেজে অধ্যক্ষ হন এমন নজিরও আছে। সকলের অবগতির জন্য সেই কৃতী অধ্যাপকদের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল—

ক্রম	নাম	অধ্যক্ষ
১।	অধ্যাপক নবকুমার ঘোষ	বিধান চন্দ্র কলেজ, রিষড়া, হুগলি
২।	অধ্যাপক অসীম কুমার দে	নেতাজী মহাবিদ্যালয়, আরামবাগ, হুগলি
৩।	অধ্যাপক অমল কান্ত হাটী	তারকেশ্বর ডিগ্রি কলেজ, তারকেশ্বর, হুগলি
৪।	অধ্যাপক অসীম কুমার সামন্ত	বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, হরিপাল, হুগলি
৫।	অধ্যাপক দীপক চক্রবর্তী	দমদম মতিঝিল কলেজ, উত্তর ২৪ পরগণা
৬।	অধ্যাপক নেপঙ্কর হাজরা	ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ, রানিগঞ্জ এবং খলিসানী কলেজ, চন্দননগর, হুগলি
৭।	অধ্যাপক দেবপ্রসন্ন বিশ্বাস	পৃথ্বীশ চন্দ্র বিশ্বাস কন্যা মহাবিদ্যালয়, দশঘরা, হুগলি
৮।	অধ্যাপক সুকৃতি ঘোষাল	মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা কলেজ, বর্ধমান
৯।	অধ্যাপক সালাউদ্দিন খান*	কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ভদ্রেশ্বর, হুগলি
১০।	অধ্যাপক মন্টুরাম সামন্ত	মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র কলেজ, কলকাতা
১১।	অধ্যাপক প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য	রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, চাঁপাডাঙা, হুগলি

মহাবিদ্যালয়ের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য প্রাক্তনী

ভরত মেটে	রাকেশ ব্যাপারী	সৌমিত্র পাল	কল্যাণ গিরি	শাশ্বতী সরকার	সুমন দেবনাথ	তনুজ দাস
ধনঞ্জয় মাইতি	বিধান বালা	উজ্জ্বল রায়	সৌরভ গিরি	সঞ্জয় সাউ	রমেশ পাল	ড. কাজী মনজুর আলি
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী	তুফান কিস্কু	নন্দিতা মাইতি	কল্লোল মণ্ডল	প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল	অভিজিৎ কুমার মাল	ড. বিয়াঙ্কর পাল
শিশির পাত্র	সুকান্ত মুখার্জি	বিপ্লব দাস	প্রিয়ব্রত ভৌমিক	পিনাকী শঙ্কর দে	অর্ণব কুমার ঘোষ	অভিজিৎ সাধুখাঁ
গৌতম সরকার	গোবিন্দ গোস্বামী	অর্ণব ব্যানার্জি	স্বরূপ মালিক	অরীন মুখার্জি	কুন্তল কুমার পাল	সুরজিৎ মোদী
অমরনাথ শীল	বিশ্বজিৎ ঘোরুই	কুমারেশ বেরা	পিন্টু শীল	কিরান্ময় মুখার্জি	শেখ সাদ্দাম হোসেন	মণিশঙ্কর দাস
তুষার সাহা	সুব্রত ঘোষ	রাকেশ কোলে	অর্কদীপ গুছাইত	রাজেন ভর	দেবদাস পাত্র	অরিন্দম চক্রবর্তী
মন্টুরাম সামন্ত	অরবিন্দ মাইতি	শুভশ্রী বেরা	সোমনাথ পাল	শীর্ষেন্দু মাইতি	পিউ চৌধুরী	ওরেনা সরখেল
পার্থপ্রতিম পাল	শতাব্দী মণ্ডল	শুভরঞ্জন যশ	উদয় কুমার খাঁ	পল্টু ব্যানার্জি	ভাস্কর হাইত	দেবাশিস মালিক

বিকাশ কাঁড়ার	বেবীনুর বেগম	পার্থ কর্মকার	দিবাকর মান্না	সৌগত দাস	তাপস পাল	শুভজিৎ ভর
অভিজিৎ বেরা	জয়ব্রত সাধুখাঁ	বিপ্লব খামরুই	টুম্পা মান্না	কৃষ্ণা সামন্ত	তন্ময় পণ্ডিত	বিশ্বজিৎ খাঁড়া
টোটন সামন্ত	শুভঙ্কর ধঁক	দেবাঞ্জন বাগ	ফরজানা খাতুন	সুভঙ্কর ঘোরুই	আশিস মালিক	পৌলোমী মাইতি
টোটন মণ্ডল	অর্ণব ঘরা	স্বদেশ জানা	পিয়ালি মণ্ডল	মেহমুদ খাতুন	বাপন বাইরি	আলেয়া মিদ্দ্যা
সৈকত মান্না	রিন্টু কোলে	মাসুদা রহমান	সোমা প্রামাণিক জানা	স্বরূপ কুমার ঘোষ	সুভম ঢোলে	জাহির আলি দেওয়ান
শেখ আমির আলী মণ্ডল	বিভাস সাঁতরা	সরোজ ঘোষ	বুশরা খাতুন	শম্পা সাঁতরা	সোমনাথ খাঁড়া	সৌভিক মোদক
অর্পিতা প্রামাণিক	চিন্ময় বেরা	সহদত সরকার	উৎপল মালি	সুরথ মুখার্জি	শেখ মো. আরিফ	কার্তিক ঘোষ
সুপ্রিয় সামন্ত	অনুপ সাঁতরা	তন্ময় মাজি	টোটন হাজরা	তপন কোলে	অপূর্ব মাইতি	অর্পিতা অধিকারী
অন্তরা মাইতি	রমেশ ঘোরুই	শ্রীমন্ত প্রামানিক	শেখ আখতার হোসেন	অভিনন্দন মাখাল	সুপ্রতিম মুখার্জি	দেবশ্রী ভৌমিক
সৌমিত্র দাস	মৌমিতা জানা	সুরজিৎ বাগ	মঞ্জুশ্রী মাইতি	অনুপ কুমার মণ্ডল	গৌতম সরকার	কাজি আমান
শুভময় ঘোষ	নীলোৎপল ঘরা	সৌরভ সাধুখাঁ	সাহিনা খাতুন	সুলভ শেঠ	সালাউদ্দিন খান	বিভাস পাত্র
শুভঙ্কর বেরা	চিত্রলেখা সেন	অর্ক ঘোষ	সুপ্রিয়া সামন্ত	দেবকুমার মুখার্জি	সঞ্জয় গুছাইত	শ্রাবন্তী নায়েক
সঞ্জিত ঘরা	প্রবীর পাল	তন্ময় সিংহরায়	সঞ্চিতা খেটো	শিবশঙ্কর ব্যানার্জি	রতিকান্ত শাসমল	শান্তনু পোল্যে
সঞ্চিতা মাইতি	রাজকুমার সাধুখাঁ	মীনা দে	রামপ্রসাদ কাঁড়ার	পৌলমি মান্না	শান্তনু দে	ধনঞ্জয় পাত্র
সুকান্ত দাস	তন্ময় মালিক	সৌম্য রানা	সঞ্জয় সাও	সন্দীপ দাস	বিবেকানন্দ মেটা	সৌরভ মোদক
বিক্রম কুমার কোটাল	তথাগত চন্দ্র	অরিন্দম সিংহরায়	সৌমিত্র দাস	অরিন্দম মুখার্জি	মানস মুলো	মহম্মদ উজাহীর
অচিন্ত্য ব্যানার্জি	হেনা পাল	রূপা বসু	বাদসা মিদ্দ্যা	মনোজ কুমার ঘোষ	রোকেয়া সুলতানা	
দেবলীনা কর্মকার	পার্বতী নন্দী	দেবস্মিতা মুখার্জি	দেবরাজ পাত্র	পারমিতা মজুমদার	সাগর সেন	
অপর্ণা খাঁ	কৃশানু বাগ	প্রবীর দাস	বাপি পাত্র	শেখ মামুদ মল্লিক	সঞ্জয় গুছাইত	
দেব কুমার মাজি	প্রসেনজিৎ শাসমল	জয়ন্ত ভর	চণ্ডীচরণ বেরা	প্রসেনজিৎ অধিকারী	তামান্না মাইতি	
অভিষেক দেবনাথ	মৌমিতা ঘোষ	সিদ্ধার্থ ঘোষ	কৃষ্ণকান্ত রায়	আনন্দ কারক	কৌশিক মুখার্জি	
তুফান মেটে	অনিমেষ মাজি	দেবাশিস পাল	সুনীতা ভৌমিক	সমীর পাত্র	লিপি চ্যাটার্জি সরকার	

ঋণ স্বীকার—

১। *বাংলার ইতিহাস সাধনা*, প্রবোধ চন্দ্র সেন, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশারস লিমিটেড, কলকাতা, ১৫-ই ভাদ্র, ১৩৬০

২। Abul-Fazl Allami, *AIN-I-AKBARI*— Vol-II, Colonel H.S. Jarrett (Translated into English), Reprint 1988, New Delhi, Crown pulications

৩। *Bengal District Gazetteers*, Hooghly, L.S.S. O,Malley & Monmohan Chakravarti, 1912

৪। Census of India, 2001, Series— 20, West Bengal, District Census Handbook (Part-A & B), District— Hugli, Directorate of Census Operations, West Bengal.

৫। *History of India, From The Earliest Times to the Present Day*, Captain L.J. Trotter & W.H. Hutton, B.D. 1917.

৬। চাঁপাডাঙা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় স্টাফ ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর অডিট রিপোর্ট: ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ সাল, ২০০৭ থেকে ২০১০ সাল এবং ২০১২ ও ২০১৩ সাল।

৭। জমি দান ও ক্রয় সংক্রান্ত দলিল ও পরচা

৮। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের ওয়েবসাইট
https://banglarbhumi.gov.in/BanglarBhumi/Home

৯। প্রসপেক্টাস, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়, ২০০২, ২০০৩, ২০০৭-৮, ২০০৮-৯, ২০১০, ২০১১, ২০১৩-১৪, ২০১৭-১৮, ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১, ২০২১-২২, ২০২২-২৩

১০। শ্রী অসিত কুমার ঘোষাল (প্রাক্তন টিচার-ইন-চার্জ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

১১। শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ সরকার (প্রাক্তন টিচার-ইন-চার্জ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

১২। শ্রী তরুণ কুমার মণ্ডল (প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

১৩। শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস (প্রাক্তন অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

১৪। শ্রী উপানন্দ রায় (প্রাক্তন অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

১৫। শ্রী অমরেন্দ্রনাথ আদক (প্রাক্তন অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, খানাকুল)

১৬। শ্রী শঙ্কর হাজরা (প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

১৭। শ্রী প্রশান্ত ভট্টাচার্য্য (বর্তমান অধ্যক্ষ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

১৮। শ্রীমতী সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন টিচার-ইন-চার্জ এবং অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

১৯। শ্রী পরেশ চন্দ্র ঢ্যাং (শিক্ষাকর্মী, শারিরশিক্ষা বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

২০। শ্রী জয়ন্ত খামরুই (শিক্ষাকর্মী, রসায়ন বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

২১। শ্রী মৃণাল কান্তি বেরা (শিক্ষাকর্মী, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

২২। শ্রী দীনবন্ধু সিংহরায় (শিক্ষাকর্মী, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

২৩। শ্রী সঞ্জয় চন্দ্র (শিক্ষাকর্মী, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

২৪। শ্রী সৌমাভ গুপ্ত (প্রাক্তন শিক্ষাকর্মী, অফিস, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

২৫। শ্রী শুভরঞ্জন যশ (অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়)

অভিজিৎ বাগ

অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় স্থাপনার ইতিহাস

১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় আমাদের বিখ্যাত সুরসিক অধ্যাপক রবীন্দ্র পরিকরকে শ্রীপ্রমথনাথ বিশী একদিন পরিহাস করে উপদেশ দিয়েছিলেন, কখনও বেশি পড়াবে না, বেশি পড়ালে বেশি ভুল পড়ানোর সম্ভাবনা, আর কখনও বেশি লিখবে না, তাতে পাঠক পীড়িত হবেন। গুরুবাক্য শিরোধার্য করে রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস লিখছি। বহুদিনের পুরোনো কথা ইতিহাসগ্রাহ্য করে লেখা কঠিন। তবু অনাগতকালের পাঠকদের জন্য চেষ্টা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সরকারি অনুমোদন মেলে ১৯৭১ সালে। কিন্তু এই প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর গল্প শুরু হয় ১৯৬১ সালে। সেই বছরে পুরশুড়া ব্লকে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির পদাধিকারীদের মধ্যে আমার স্থান হয়েছিল। এই কমিটি সাতদিন ধরে নানা অনুষ্ঠান করেছিল। জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপনের সময়েই এই কমিটির সদস্যরা প্রস্তাব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নামে এলাকায় একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের পরে উপযুক্ত জমির খোঁজ শুরু হয়। কিন্তু বন্যাপ্লাবিত পুরশুড়া থানায় উপযুক্ত জমি মেলেনি। পরিকল্পনা রূপায়ণ করা যাচ্ছে না বলে অনেক উদ্যোক্তা এই কাজ থেকে বিরত হলেও আমার মনের কোণে সে ইচ্ছাটা রয়েই গেছিল। বছর চারেক পরে, আমার এক সম্পর্কিত ভগ্নীপতি চাঁপাডাঙার স্বর্গত সুধীর চন্দ্র হাজরা আমাকে বলেন, 'আমার দাদার চাঁপাডাঙার বালি মাঠে বিঘা দশেক জমি আছে, জমির মধ্যে একটি বড়ো পুকুর আর তার চারপাশে ৯০ থেকে ১০০ ফুট চওড়া পাড় আছে। তুমি চাইলে দাদাকে রাজি করানোর চেষ্টা করব।' এ যেন বহুদিনের অভুক্তকে পলান্ন খাওয়ার নিমন্ত্রণ!

এই ঘটনার একটু প্রাক্‌কথন প্রয়োজন। আমার বাবা স্বর্গত সুবল চন্দ্র আদক স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজকর্মী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সাধারণ মানুষ ও চাঁপাডাঙার ব্যবসায়ী মহল তাঁকে খুব শ্রদ্ধা, সম্মান করতেন। সুবল চন্দ্র আদকের পুত্র হওয়ার সুবাদে বাবার বন্ধুস্থানীয় চাঁপাডাঙার ব্যবসায়ী মহল আমাকেও খুব স্নেহ করতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রসাদ চন্দ্র মণ্ডল, নন্দলাল দত্ত, কাশীনাথ মণ্ডল, রাসবিহারী সাধুখাঁ, নিত্যানন্দ অধিকারী প্রমুখ। পরবর্তীকালে কলেজস্থাপনের অধ্যায়ে যাঁদের পাশে পেয়েছি, তাঁদের অধিকাংশকে আমি অনেক আগে থেকেই কাকা বা জ্যাঠামশাই বলে ডাকতাম। এই প্রাথমিক গ্রহণযোগ্যতাটুকুই আমার এত বড়ো স্বপ্ন ধাওয়া করার প্রয়োজনীয় উপাদান ছিল। সেইজন্য সদ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ডিগ্রি পাওয়া এক নবীন যুবকের হাতে জমি তুলে দিলে যে সেটা বিফলে যাবে না, সুধীরদার এই অটল বিশ্বাসের কারণ আমার বাবার বিশ্বাসযোগ্যতা।

জায়গাটি দেখে আমার খুব পছন্দ হয়ে গেল। সুধীরদা স্বর্গীয় নিতাই চন্দ্র হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে গেলেন। কি জানি কী ছিল বিধাতার মনে, আমাকে দেখেই তাঁর আমাকে খুব ভালো লেগে গেল, সন্তানহীন নিতাইচন্দ্র হাজরা পুত্রলাভের আনন্দে ওই জমি দিতে স্বীকৃত হলেন। এই সময়ে তারকেশ্বর ব্লকে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করছিলেন স্বর্গত নিত্যানন্দ অধিকারী মহাশয়। তিনি

আমাকে বললেন, চলো একসঙ্গে কলেজ করার চেষ্টা করা যাক।

১৯৬৪ সালের ৪ ডিসেম্বর চুঁচুড়া রেজিস্ট্রি অফিসে জমির দলিল সম্পাদিত হয়। দাতা শ্রীমতি ফেলুবালা হাজরা, স্বামী শ্রী নিতাই চন্দ্র হাজরা। গ্রহীতা—১) শ্রী নিতাই চন্দ্র হাজরা ২) শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারী ৩) অমরেন্দ্রনাথ আদক। স্ট্যাম্প পেপার কেনার ১৯০০০ টাকা দিয়েছিলেন শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারী মহাশয়। সেদিন সর্বক্ষণ সঙ্গে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ শ্রী নন্দলাল দত্ত মশাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, কেবল নিতাই চন্দ্র হাজরা মহাশয় নন, পাশাপশি আরও অনেক মানুষ ভূমিদান করেন। পার্শ্ববর্তী জমি দান করেন পুরশুড়ার জনাব নসি হক, চাঁপাডাঙার শ্রী রোহিনীমোহন ধাওয়া, শেখ মহিম মিদ্যা, শ্রী কার্তিক চন্দ্র ঢ্যাং প্রভৃতি কয়েকজন। শেখ মহিম মিদ্যার দখলে থাকা খাসজমি ও অন্যান্য কয়েকখণ্ড জমি নিয়ে পরবর্তীকালে কলেজে খেলার মাঠ তৈরি হয়।

একটি সরস ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাক। অহল্যাবাই রোড থেকে কলেজের পুকুরপাড় পর্যন্ত গাড়ি চলার মতো চওড়া রাস্তা তৈরি হচ্ছিল। এই জমির মালিক ছিলেন তিনি চাঁপাডাঙার শেখ ইউসুফ আলি মিদ্যা। তিনি খুব রেগে গেছেন শুনে পরেরদিন সকালে হাজির হলাম তাঁর বাড়ি। গিয়ে বললাম, আমি সুবল মাস্টারের ছেলে। রাস্তাঘাটে কেন মাথা ফাটাবেন, তাতে আপনার বদনাম হবে, তার থেকে বাড়িতেই মাথা ফাটান। তিনি একগাল হেসে বললেন, এসেছ, চা পানের পরে যাবে। এরকম কত মানুষের যে ভালোবাসা পেয়েছি, কত মানুষের দান গ্রহণ করেছি তার সীমা পরিসীমা নেই।

জমি রেজিস্ট্রির পরে ভবনের একটি নকশা তৈরি করা হয়। নকশা অনুযায়ী মহাবিদ্যালয়ের ভিত খোলার কাজ শুরু হয়। চাঁপাডাঙা ও রানাবাঁধ গ্রামের বহু মানুষ এই কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছিলেন। কলেজ ভবন স্থাপনার প্রথম দিন থেকে সমস্ত দান ও ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কোষাধ্যক্ষ নন্দলাল দত্ত মহাশয়। অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি শেষপর্যন্ত সেই দায়িত্ব পালন করেন।

এই কলেজ তৈরির জন্য বিভিন্ন মহানুভব মানুষের আর্থিক দানের কথা বলতেই হয়। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন এলাকায় দেশ গঠনের যে কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছিল, তারই অঙ্গ স্বরূপ বিভিন্ন মানুষের উদ্যোগে এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়া শুরু হয়। সম্ভবত ইংরেজ শাসন এবং আমাদের দেশ বরেণ্য মনীষীগণ একটা কথা দেশের মানুষকে বুঝিয়েছিলেন, দেশ গড়তে গেলে লেখাপড়াটা দরকার। আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাব, তারকেশ্বর থানা বা আরামাবাগ মহকুমার অনেক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় গড়ার কাজ শুরু হয় গত শতাব্দীর পঞ্চাশের শেষ বা ষাটের দশকের প্রথম দিকে। আর এই কাজে অর্থ জোগানোর কাজটি কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন নিজ নিজ এলাকার সম্ভ্রান্ত বা বিত্তশালীরা, এমনকি সাধারণ মানুষও। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের পক্ষে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যালয় স্থাপনের মতো তহবিল ছিল না।

এ প্রসঙ্গে একটা মজার কথা বলি। অনেকবারই টাকার অভাবে কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভবন নির্মাণকালে অর্থ সংকট চলছে শুনে নিতাই চন্দ্র হাজরা মহাশয় আমাকে ডাকলেন। একদিন গেলাম। বললেন, তুমি ভিতরে এসো। গিয়ে দেখা গেল, লঙ্কা হলুদ তেজপাতার বস্তা রয়েছে। নিতাইদাবললেন, তুমি একটা বস্তা নাও। আমি হেসে বললাম, আপনার ঠাট্টা তো মন্দ নয়—তেজপাতার বস্তা নিয়ে আমি

কী করব? নিতাইদা তখন একটি বস্তা উপুড় করে দিলেন। বস্তার ভিতর গোছা গোছা একশো টাকার নোট। আমি তো অবাক। সেই টাকা গামছায় করে বেঁধে দুজনে কোষাধ্যক্ষ নন্দলাল দত্ত মশাইয়ের কাছে দিয়ে এলাম। ২০০০০ টাকা। তখন সোনার ভরি ছিল একশো পঁচিশ টাকা। কেবলমাত্র জমিই নয়, ভবন নির্মাণে তিনি এইভাবে অর্থসাহায্য করেছিলেন। তাঁকে এই এলাকার মানুষ জানতেন অত্যন্ত কৃপণ মানুষ বলে। তিনি হয়ে গেছিলেন শ্রেষ্ঠ দাতা। তাঁর দেওয়া জমির তৎকালীন মূল্য ছিল ৫০০০০ টাকা। তারপরে দিলেন এই নগদ টাকা। আগেই বলেছি নিত্যানন্দ অধিকারী মশাই স্ট্যাম্প পেপার কেনার ১৯০০০ টাকা দিয়েছিলেন। তারকেশ্বর মন্দির এস্টেট থেকে পাওয়া গিয়েছিল ৫০০০ টাকা। কলেজের অনুমোদনের সিকিউরিটি ডিপোজিটের ২৫০০০ টাকা দিয়েছিলেন চাঁপাডাঙার ব্যবসায়ী পুরশুড়া ব্লকের রণবাজপুর গ্রামনিবাসী শ্রী মনীন্দ্র নাথ রায় মহাশয়। পরবর্তীকালে লাইব্রেরির বই কেনার জন্য তিনি আরও ১০০০১ টাকা দান করেন।

তবে কলেজ নির্মাণের মূল তহবিলটি জোগাড় করা হয়েছিল এক বিশেষ উপায়ে। চাঁপাডাঙা বাজারের সদস্য ব্যবসায়ীগণ কলেজ ভবন নির্মাণের জন্য একটি শিক্ষাবৃত্তি চালু করেছিলেন। সেই ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি ছিলেন বিনোদ মাজি মহাশয়। প্রতি মণ লেনদেনে ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে এক আনা করে শিক্ষাবৃত্তি দিতে হত। বড়ো বড়ো আড়ত থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করা হত। এছাড়াও চাঁপাডাঙাতে ব্যবসার জন্য লরি ঢুকলেই গাড়িপিছু ২ টাকা করে দিতে হত। সে টাকার পরিমাণও অল্প ছিল না। বড়ো বড়ো আড়ত থেকে শিক্ষাবৃত্তির অর্থ সংগ্রহের কথা শুনে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় একবার আমাকে বলেছিলেন, তুমি কি এখানকার সরকার যে শিক্ষাবৃত্তি চালু করেছ? উত্তরে হেসে বলেছিলাম, কী আর করা যাবে, মানুষের স্বেচ্ছায় দানের উপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।

এবার তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস স্মরণীয়। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপর্যয় ঘটে। নিত্যানন্দ অধিকারী মহাশয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। মহাবিদ্যালয় ভবন অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকে। ভবনটি নিশিকুটুম্বদের নৈশাবাসে পরিণত হয়। প্রায় চার বছর সমস্ত কাজ বন্ধ ছিল। ১৯৭১ সালে তারকেশ্বর কেন্দ্রে কংগ্রেসের প্রার্থী হন খানাকুলের রাজা রামমোহন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বর্গত রামসিংহ পাল। তাঁর নির্বাচনকর্মী ছিলেন চাঁপাডাঙার ব্যবসায়ী প্রাণকৃষ্ণ মন্ডল, অমিয় কুমার গুপ্ত, শুকদেব দত্ত, বৈদ্যনাথ দত্ত প্রমুখ। তাঁর পরাজয়ে এই কর্মীরা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। এঁরা সকলেই ছিলেন আমার চাঁপাডাঙা হাইস্কুলের বন্ধু বা সহপাঠী। একদিন তাঁরা আমায় বললেন— 'তোমার জন্য আমাদের কাজকারবার সব বন্ধ হল, আমরা কী করব?' উত্তরে বললাম— 'কাজের অভাব কী, চলো কলেজটা করা যাক।' নতুন কমিটি তৈরি করা হল। আমাকে করা হল সম্পাদক। নবীন উৎসাহে আবার কাজ শুরু হল।

১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃত্বে একটি স্বল্পকালীন সরকার গঠিত হয়। হুগলি জেলায় একটি অ্যাড-হক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়। আমি ছিলাম সেই কমিটির সম্পাদক। প্রস্তাবিত কলেজ ভবনের পাশে জেলা কংগ্রেসের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন এই স্বল্পকালীন সরকারের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শান্তিকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়। তিনি ছিলেন আমার কলেজ জীবনের অধ্যাপক। তিনি কলেজের পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে দেখিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, এটা

কীসের বাড়ি? উত্তরে তাঁকে কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা ও তারপর তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার বৃত্তান্ত বললাম। বললাম, কেন কাজটি বন্ধ হয়ে আছে। তাঁকে আমরা অনুরোধ করলাম, আপনি অনুগ্রহ করলে কলেজটি হতে পারে। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, তুমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে বলো, পরে আমি দেখব। কলেজের সরকারি অনুমোদনে তিনি আমায় অনেক সাহায্য করেন। পরবর্তীকালের সরকারের শ্রমমন্ত্রী ডা. গোপাল দাস নাগের সুপারিশে পূর্তমন্ত্রী ভোলানাথ সেন কলেজ রোড সংস্কার করে দেন।

সেই সময় কলেজ প্রতিষ্ঠায় সরকারি অনুমোদন বন্ধ ছিল। শর্ত ছিল নিজের দায়িত্বে কলেজ করতে হবে। এ জন্য এই ধরনের কলেজগুলিতে 'মুচলেকা কলেজ' বলা হত। তখন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কলেজসমূহের পরিদর্শক ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের পূর্বতন অধ্যাপক শ্রী আর্য কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি ছিলেন আবার আমার দাদা আরামবাগ কলেজের অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ আদকের ছাত্রজীবনের অধ্যাপক। দাদা আর্যবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। অতঃপর তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। কলেজের অনুমোদনের জন্য পরিদর্শনে এসে অনেক শর্ত অপূর্ণ থাকলেও তিনি সরকারি অনুমোদনের ব্যবস্থা করে দেন। কলেজ অনুমোদনের জন্য যে আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়েছিল সেটি মুসাবিদা করে দিয়েছিলেন আর্যবাবুর সহকর্মী তথা ডেপুটি রেজিস্ট্রার সত্যপ্রসাদবাবু। পরে জেনেছিলাম তিনি অধ্যক্ষ রামসিংহ পালের সহপাঠী ছিলেন। এইভাবে কত মানুষ যে কতরকমভাবে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে বা সরাসরি সাহায্য করেছেন, তা মনে পড়লে মনে হয়, সবকিছুই যেন ঈশ্বর নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।

পুরোনো কাগজপত্র দেখতে গিয়ে কলেজের কয়েকটি সভার বিবরণীর কপি একবার হাতে পেয়েছিলাম। সেই কাগজগুলি থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, সেগুলোর অল্প কয়েকটির উল্লেখ করা হল। কলেজ তৈরির পর একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সভা আহ্বান করা হয়েছিল— সেটা ১৯৭১ সালের ৫-ই নভেম্বর। সেই সভায় আমি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয় নিত্যানন্দ অধিকারী, প্রসাদ চন্দ্র মণ্ডল, নন্দলাল দত্ত, প্রাণকৃষ্ণ মন্ডল, অমিয় কুমার গুপ্ত, শুকদেব দত্ত, ললিত মোহন হাজরা। ইতিমধ্যেই বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫.১০.১৯৭১/১.১১.১৯৭১ তারিখের আই/সি/৪৩৭/৭১ সংখ্যক পত্র অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাবিত রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়কে অনুমোদন দেয়। সেজন্য সভায় সবার প্রথমে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এই সভায় ১৭ জনের একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। প্রসাদ চন্দ্র মণ্ডল সভাপতি, নন্দলাল দত্ত কোষাধ্যক্ষ এবং আমাকে পুনর্বার সম্পাদক করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

প্রথমে বাণিজ্য বিভাগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। ২৪.১২.১৯৭১ তারিখের দ্বিতীয় সভাতে শ্রী রণজিৎ কুমার সামন্তকে পূর্ণসময়ের বাণিজ্য বিভাগের, শ্রী অসিত কুমার ঘোষাল ও শ্রী নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায়কে যথাক্রমে ইংরেজি ও বাংলা বিভাগের আংশিক সময়ের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। শ্রীবটকৃষ্ণ খানসহ অন্য কয়েকজনকে কলেজের অন্যান্য সহায়ক পদে নিয়োগ করা হয়। অধ্যাপক রণজিৎ কুমার সামন্ত প্রথম কলেজ পরিচালনা করার দায়িত্ব পান। কিন্তু স্বল্পকাল পরে তিনি পদত্যাগ করলে অধ্যাপক অসিত কুমার ঘোষাল সেই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন।

কলেজে প্রথম স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হয় বাণিজ্য বিভাগের দুটি পদে— শ্রী উপানন্দ রায়

ও শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ সরকারকে। ২৪.৪.৭২ তারিখে একটি জরুরি সভা আহ্বান করা হয়। সেখানে আলোচনা হয় বিশ্ববিদ্যালয় ইউ.ই (ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স) এবং কলা বিভাগে তিন বছরের ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির অনুমোদন দিয়েছে। সেই অনুমোদনের সঙ্গে পূর্ণ সময়ের অধ্যক্ষ, ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পূর্ণসময়ের অধ্যাপক নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে শ্রী চিত্তরঞ্জন দাসকে ইংরেজি বিভাগে, ইতিহাস বিভাগে শ্রী প্রদীপ কুমার পাল, দর্শন বিভাগে শ্রী ফাল্গুনী গুপ্ত মজুমদার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শ্রী নির্মল চন্দ্র দাসকে স্থায়ী পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। ২৯.১২.৭২ তারিখের সভায় ব্রহ্মচারী চৈতন্য (শ্রী জ্যোতিপ্রসাদ বসু, এম এ বি টি, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন)-কে পূর্ণ সময়ের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া বাংলা বিভাগে শ্রী নিশীথ কুমার মুখোপাধ্যায় ও অর্থনীতি বিভাগের শ্রী মোহিনী কুমার মান্নাকে স্থায়ীপদে নিয়োগ করা হয়। ১৩.৯.১৯৭৩ তারিখের সভায় অধ্যক্ষ জানান যে ১৯৭১ সালে যে প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছিল এই সভাই তার শেষ সভা কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশমতো কলেজের গভর্নিং বডি (পরিচালন সমিতি) গঠন করা হয়েছে। ১৯.১১.৭৩ তারিখ সোমবার এফিলিয়েটেড বা পোষিত কলেজের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে গঠিত প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। কমিটির স্থায়ী সদস্য হিসাবে এই ক-জনের নাম বিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে। ১) শ্রী অসিতবরণ হাজরা (দাতা) স্বর্গত নিতাই চন্দ্র হাজরার ভ্রাতুষ্পুত্র, ২) শ্রী শৈলেন্দ্র নাথ সরকার (শিক্ষক প্রতিনিধি) ৩) শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস (শিক্ষক প্রতিনিধি) ৪) শ্রী অমরেন্দ্র নাথ আদক (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রতিনিধি) ৫) ড. তাপস চৌধুরী (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রতিনিধি) ৬) ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য, অধ্যক্ষ। এই সভাতে শ্রী প্রসাদ চন্দ্র মণ্ডল মহাশয়কে পরিচালন সমিতির সভাপতি এবং আমাকে সম্পাদক করা হয়। মোট সাত বছর আমি পরিচালন সমিতির সম্পাদক পদে ছিলাম। কলেজ অনুমোদনের পর থেকে পাঁচ বছর আমি সম্পাদকের পদে কাজ করেছিলাম। তারপর এল পালাবদলের পালা—রাজ্যে এবং কলেজেও।

আগামীকালের মানুষের জন্য এই স্মৃতিচারণা, আর একটু ইতিহাস ছুঁয়ে দেখার প্রয়াস। কালের গর্ভে কথা হারিয়ে যায়, স্মৃতি যায় হারিয়ে। হারিয়ে যায় চেনা গ্রামের নাম, যেমন চাঁপানগর হয়ে যায় বর্তমান চাঁপাডাঙা। এ তথ্য পেয়েছি দশঘরার জমিদারদের দেওয়া খাজনার রশিদে। অনেক প্রণম্য মানুষের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল এই কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে। কত লড়াই, কত ভালোবাসা, কত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা। যতজনের কথা মনে পড়ল বললাম। বার্ধক্যের কারণে স্মৃতি দুর্বল হয়েছে। অনেক কথা, অনেকের কথা মনে করতে পারিনি। অনেক ঘটনা মনে পড়েনি। ভোলানাথের আপন দেশে পুরোনোকে ভুলে সামনের দিকে এগিয়ে চলার মন্ত্র হল— চরৈবেতি। সে মন্ত্রে রচিত হল রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের পথের পাঁচালি।

অমরেন্দ্রনাথ আদক
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বছর

প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের প্রতিষ্ঠার বা ব্যক্তির জন্মের পঁচিশ/পঞ্চাশ/ষাট/পঁচাত্তর/একশো...বছর পূর্তি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা উদ্‌যাপন করি। প্রচলিত এই ধরনের প্রথাকে উপলক্ষ করেই রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (এবং নামকরণ) হয় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে।

প্রাচীনকাল থেকেই দামোদর নদের প্রবাহ এবং তার সাথে আসা পলিমাটি তারকেশ্বর-পুরশুড়া থানার বিস্তীর্ণ এলাকার জমিকে উর্বরা করে। কৃষিপণ্যের উন্নত বাজার তৈরি হয়। চাঁপাডাঙা ছিল মার্টিন রেলওয়ের প্রান্তিক স্টেশন এবং ওল্ড বেনারস রোডের যাত্রাপথ ছিল চাঁপাডাঙার মধ্য দিয়ে। ফলে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা (জলপথ, স্থলপথ, রেলপথ)-এর জন্য চাঁপাডাঙা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাবসাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে। হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকার সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগের মাধ্যম ছিল চাঁপাডাঙা। তবে চাঁপাডাঙার ব্যাবসাবাণিজ্য গড়ে উঠেছিল মার্টিন রেলের সুবিধার কারণে। তার আগে নৌবাণিজ্যের সময় বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল চাঁপাডাঙার অনতিদূরে দামোদরের পশ্চিম তীরে পুরশুড়ার শ্রীরামপুরে। অবশ্য শুধু শ্রীরামপুর নয়, শ্রীরামপুর সহ দামোদরের পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হাজার বছর আগে ছিল বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এই অঞ্চলকে বলা হত ভূরিশ্রেষ্ঠ (ভুরশুট)। আকবরের সময় ভুরশুট ছিল একটি পরগণা। মধ্যযুগে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তিনশো বছর ভূরিশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য পূর্ব ভারতের অন্যতম বড়ো শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দামোদরের বুক দিয়ে বইত গঙ্গার জলধারা, দুকূল সাজিয়ে ছিল শ্রেষ্ঠীদের বাসগৃহ। বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের এনে এখানে তাঁদের ভূমি দান করে বসতি গড়ে দিয়েছিলেন। গড়ে উঠেছিল বিদ্যাকেন্দ্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় ছিলেন পেঁড়ো ভুরশুটের বাসিন্দা। ভূরিশ্রেষ্ঠ নগরীতে বাস করতেন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত কোন্দলিকার মাধবাচার্য। ভুরশুট ছিল সারস্বত সাধনার এক প্রখ্যাত লালনভূমি। প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন দামোদরের করাল গ্রাসে বিলীন হয়ে গেছে। কিছু নাম রয়ে গেছে— ডিহিভুরশুট, পারভুরশীট।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, যুক্তিবোধের উন্মেষে হুগলি জেলার এক বিশিষ্ট স্থান আছে। মুসলমান রাজত্বকালের শেষদিকে ইউরোপীয় বণিক ও পাদরিরা ভাগীরথী তীরবর্তী অধুনা হুগলি জেলার নানাস্থান ব্যান্ডেল (পর্তুগিজ), হুগলি (ব্রিটিশ), চুঁচুড়া (ডাচ), চন্দননগর (ফরাসি), চাঁপদানী-ভদ্রেশ্বর (জার্মান, বেলজিয়ান), শ্রীরামপুর (দিনেমার), রিষড়া (গ্রিক), কোন্নগর (অস্ট্রিয়ান, আর্মেনিয়ান)-এ বসবাস করেন বলে ইংরেজি

শিক্ষা হুগলিতে সর্বপ্রথম বিস্তার লাভ করে। যতদূর জানা যায় পর্তুগালের জেসুইট সম্প্রদায় কর্তৃক ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলি শহরে স্থাপিত বিদ্যালয়টি ইংরেজি শিক্ষার প্রথম বিদ্যায়তন। এর কিছুদিন পর একজন ফরাসি জেসুইট ব্যান্ডেলে আর একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীরামপুর মিশনারিজ কর্তৃক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দু-শতক আগে এই দুটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বর্ণ প্রসবিনী জেলা হুগলি মনীষার শ্রীক্ষেত্র। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, খানাকুলের সর্বাধিকারীরা, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সতীশ মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রঙ্গলাল, প্যারীচাঁদ, শিবচন্দ্র দেব, রামগোপাল ঘোষ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন গুপ্ত, জ্ঞানচন্দ ঘোষ, সহায়রাম বোস, উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, শিশির মিত্র, তারকনাথ পালিত, উইলিয়াম কেরী হুগলি জেলার বা এই জেলার সঙ্গে সম্পর্কিত মনীষীরা জেলা তথা দেশের শিক্ষাবিস্তারে ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নির্মাণে এক অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন।

ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারে অনুপ্রাণিত তারকেশ্বর-পুরশুড়া থানা এলাকার বিশিষ্ট কিছু সমাজসেবী, ব্যবসায়ী, কৃষক এমনকি নিরক্ষর নাগরিক ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে বিশ্বকবির দুই ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন-এর অনুসরণে চাঁপাডাঙা এলাকায় দুটি প্রতিষ্ঠান (শিক্ষামূলক ও কর্মমূলক) তৈরির উদ্যোগ নেন। ১৯৬৩ সালে এই এলাকায় আধুনিক আলু চাষের প্রসারের জন্য আলুবীজ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তৈরি হয় ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সমবায় হিমঘর তারকেশ্বর-পুরশুড়া কোঅপারেটিভ কোল্ড স্টোরেজ (এই হিমঘরের চেয়ারম্যান থাকার সুবাদে দিল্লিতে সমবায় হিমঘরগুলির জাতীয় কর্মশালায় যোগদান করে দেখেছিলাম এন সি ডিসি-র পরিচালকরা ভারতবর্ষের সবচেয়ে উন্নত মানের আলু চাষের এই এলাকায় আধুনিক আলু চাষের প্রসারে এই হিমঘরের অবদানের কথা কী শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করছেন)। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য ১৮ জন সদস্য নিয়ে একটি প্রস্তুতি কমিটি তৈরি হয়—প্রসাদ চন্দ্র মণ্ডল (সভাপতি), নিত্যানন্দ অধিকারী (সম্পাদক, ০৪.১১.১৯৭১ পর্যন্ত), অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক (সম্পাদক, ০৫.১১.১৯৭১ থেকে), অধ্যক্ষ রামসিংহ পাল, নন্দলাল দত্ত, পাঁচকড়ি পাল, প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল, বৈদ্যনাথ দত, শুকদেব দত্ত, অমিয়কুমার গুপ্ত, অজিতকুমার মাজি, সেখ আনোয়ার আলি মিদ্যা, শান্তি মোহন রায়, রমেন মৈত্র, ললিত মোহন হাজরা, সেখ বি জে নস্কর, সেখ গণি মিদ্যা, কাশীনাথ মণ্ডল। যা হোক, প্রয়োজনীয় জমি না-পাওয়ার কারণে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির প্রচেষ্টা থমকে যায়। অবশেষে, চাঁপাডাঙা নিবাসী প্রয়াত নিতাই চরণ হাজরা ও তাঁর স্ত্রী ফেলুবালা হাজরা অহল্যাবাই রোড (ওল্ড বেনারস রোড) এর পাশে তিনশো সাত শতক জমি ও নগদ ২০, ০০০ টাকা দান করেন (মোট সংগৃহীত অর্থ ২, ২০, ৬৮৪ টাকা)। পুকুরের উত্তর পাড়ে দ্বিতল ভবন নির্মাণ করে ১৯৭১ সালে ৮-ই নভেম্বর রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বাণিজ্য বিভাগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সে ৮ জন ছাত্রকে নিয়ে পথ চলা শুরু হয়।

মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতীয় পরিস্থিতির ইতিবাচক অবদান ছিল। ব্রিটিশদের দুশো বছরের শোষণশাসনে বিধ্বস্ত ভারতের (ইংরেজ আগমনের প্রাক্কালে বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অংশ ছিল ২০ শতাংশ যা ইংরেজ শাসনের শেষে গিয়ে দাঁড়ায় ৩ শতাংশে) অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের নেতৃত্বে স্বনির্ভর অর্থনীতি তৈরির ঘোষিত লক্ষ্যে নানা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান (SAIL, BHEL, NTPC, DRDO, HAL, CCFL, AIIMS, LIC...) গড়ার উদ্যোগ শুরু হয়। এইসব প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নানাবিধ শিক্ষা/গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ার একটি দিক ছিল গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ

স্থাপন। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পরিচালনা ও আর্থিক সহায়তা দানের লক্ষ্যে তৈরি হয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (১৯৫৩)। পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলি উচ্চশিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ করতে থাকে। সরকারি সহায়তা পাওয়ার ভবিষ্যত আশা বেসরকারি উদ্যোগে গতি সঞ্চার করে। মাত্র সতেরো বছরের মধ্যে পাঁচটি লাগোয়া ব্লকে পাঁচটি কলেজ গড়ে ওঠে: অঘোর কামিনী প্রকাশ চন্দ্র কলেজ (১৯৫৯), রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয় (১৯৬৪), বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় (১৯৬৬), রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় (১৯৭১), শরৎ সেন্টিনারি কলেজ (১৯৭৬)।

পঞ্চাশ বছরের যাত্রা পথে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, চড়াই-উতরাই-এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। প্রথম দুবছর সরকারের কাছে কোনোরকম বেতন দাবি করা হবে না (আন্ডারটেকিং কলেজ) এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাত্রা শুরুর প্রথম বছরেই মার্টিন রেলওয়ে বন্ধ হয়ে যায় (১৯৭১)। চাঁপাডাঙার ব্যাবসাবাণিজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যা হোক, ব্যবসায়ী, কৃষক এবং অন্যান্য অংশের মানুষের কাছ থেকে ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে ঈশ্বর বৃত্তি বাবদ যে আদায় মোকামে হত তা বজায় ছিল এবং তার একটা অংশ কলেজ পরিচালনা/ উন্নয়নের জন্য দেওয়া হত। অল্প কিছু ভাতা (পকেট অ্যালাউন্স) নিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলেজ সচল থাকে, প্রতি বছর ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

দু-বছর পর সরকারের কাছ থেকে বেতন বাবদ অনুদান আসতে শুরু করলে সমস্যার সুরাহা হতে থাকে। অবশেষে, ১৯৭৯ সালে রাজ্য সরকার পে প্যাকেট স্কিম চালু করে রাজ্যের সমস্ত অনুমোদিত কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতনের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে ল্যাবরেটরি উপকরণ, বই, বিল্ডিং নির্মাণখাতে অর্থ বরাদ্দ আসতে শুরু করে। সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে গতি আসে। এই পর্যায়ে (১৯৭৯-৯০) অনুকূল পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে ২২-টি নতুন বিষয়ের (অনার্স/জেনারেল) পঠনপাঠন শুরু হয়।

বিগত শতকের নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে নতুন ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। শিক্ষার দায়িত্ব কেবল সরকারের এই ধারণার বদল ঘটতে থাকে, কমতে থাকে সরকারি বিনিয়োগ ও সাহায্য। বিশ্বায়ন ও নয়া উদারনীতির কারণে বেসরকারি ভূমিকার গুরুত্ব বাড়তে থাকে। কিন্তু এটা পুরোনো দিনের বেসরকারি উদ্যোগ নয়, এটা হল বেসরকারি বিনিয়োগ যেখানে থাকে লাভ-ক্ষতির হিসাব। গড়ে উঠতে থাকে সেলফ ফিনান্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দেওয়া হয় হতে থাকে সেলফ ফিনান্সিং কোর্স খোলার জন্য। আধুনিক বিষয়/বিভাগ চালু করতে হবে, কারণ যুগের চাহিদা। কিন্তু দায়দায়িত্ব সব কলেজের। এরকম পরিস্থিতিতে কলেজবাধ্য হয় সেলফ ফিনান্সিং ভিত্তিতে মাইক্রোবায়োলজি অনার্স কোর্স চালু করতে (পরবর্তী কালে সেলফ ফিনান্সিং ব্যবস্থা বন্ধ হয়)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়েই প্রথম এই বিষয় চালু হয় বলে কলেজকে সিলেবাস তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। এই সময়ের একটি বড়ো সমস্যা হয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পদ সংক্রান্ত। কলেজের প্রথম ন্যাক মূল্যায়ন (২০০৬) করতে হয় এমন একটা পরিস্থিতিতে যখন স্টাফ প্যাটার্ন অনুযায়ী প্রাপ্য ২২-টি শিক্ষক পদ এবং ২৯-টি শিক্ষাকর্মী পদের অনুমোদন পাওয়া যায়নি এবং ১৩-টি অনুমোদিত পদ শূন্য (অবসর/পদত্যাগের কারণে) ছিল। যে কারণে কলেজকে নিজস্ব তহবিল থেকে বেতনের ব্যবস্থা করে ৩৫ জন আংশিক সময়ের শিক্ষক এবং ৬ জন ক্যাজুয়াল শিক্ষাকর্মী নিয়োগ

করে পঠনপাঠন ও অন্যান্য পরিষেবা চালু রাখতে হয়। পরবর্তীকালে এই তীব্র আর্থিক সংকটের অনেকটা নিরসন হয় আংশিক সময়ের শিক্ষকদের বেতন সংক্রান্ত দায় দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করায় (অবশ্য টিউশন ফি বাবদ আদায়ের অর্ধেক সরকারকে দিতে হয়)।

অবসর গ্রহণের প্রায় ন-বছর বাদে কলেজের এই মুহূর্তের পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব নয়, সমীচীনও নয়। তবে সাধারণ কিছু কথা বলা যায়। সামাজিক চাহিদা থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়, টিকেও থাকে সামাজিক চাহিদা অনুসারে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে শিক্ষাদানের উন্নত গুণমান যেমন প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার শর্ত তেমনি এটাও ঠিক অভিভাবকরা সন্তানদের না পাঠালে প্রতিষ্ঠান চলবে না। খাদ্য থাকলেই হয় না, খিদেও থাকা চাই। সর্বত্রই উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ছাত্র এবং অভিভাবকদের অনাস্থার ভাব বাড়ছে। ভর্তির হার কমছে। অনেক আসন ফাঁকা পড়ে থাকছে। প্রশ্ন করলে উত্তর আসছে: কী হবে পড়ে! এই মুহূর্তে আমাদের দেশে বিদ্যালয় পাশ ছাত্রদের কলেজে ভর্তির হার ২৭%। বিদ্যালয় স্তরে ড্রপ আউট বেশি হলে কলেজে ভর্তির হার কমে। একটি হিসাবে দেখা যায় ২০০৬ সালে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়া ১৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২০১৮ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে ৬ লক্ষ। অর্থাৎ প্রতি ৩ জনে ২ জন উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে না। স্বাভাবিকভাবেই কলেজে ভর্তির চাহিদায় ঘাটতি দেখা দেবে। যাহোক, চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। অভিভাবকদের সঙ্গে শিক্ষকদের সভা করা দরকার (ন্যাকের সুপারিশেও বলা হয়)।

নানা অসুবিধা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অর্জিত সাফল্যের খতিয়ান নেহাত ছোটো নয়: অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী, যথেষ্ট সংখ্যক বিষয় থেকে পছন্দমতো প্রোগ্রাম (subject combination) বেছে নেওয়ার সুযোগ, পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, বৃহৎ গ্রন্থাগার, সবুজ খোলামেলা ক্যাম্পাস, প্রমাণ মাপের (eleven side) খেলার মাঠ, বাস্কেটবল কোর্ট, ভলিবল/ব্যাডমিন্টন কোর্ট, মাল্টিজিম, এন এস এস, এন সি সি ইউনিট, ছাত্রীদের হোস্টেল পরিকাঠামো, বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় সাফল্য, খেলাধুলায় প্রশংসনীয় ভূমিকা। অসরকারি কলেজ সমূহের রাজ্য স্তরের ফুটবল প্রতিযোগিতায় (২০০৬) সল্ট যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনাল ম্যাচে জয়ী হয়ে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন্স হওয়া কলেজের খেলাধুলার ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়স্তরের প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে সেরার শিরোপা পাওয়ার পরিসংখ্যানে কলেজের স্থান একেবারে উপরের দিকে।

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফাইনাল ম্যাচ আমার কাছেও স্মরণীয় একটি কারণে। ওইদিন আমি মাঠে ছিলাম। একজন কর্মকর্তা আমাকে সাইড লাইনের কাছাকাছি একটি চেয়ারে বসিয়ে বলেছিলেন, 'স্যার, আমরা এই জায়গায় কাউকেই বসতে দিই না, এমনকি ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের কর্মকর্তাদেরও নয়। কিন্তু আপনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, আপনার আলাদা সম্মান।' আমাদের খেলোয়াড়দের ডেকে বললেন, 'সল্টলেক স্টেডিয়ামে খেলার স্বপ্ন সেরা খেলোয়াড়দেরও সবার পূরণ হয় না। তোমাদের জীবনে এটা একটা বিরাট সম্মানের ব্যাপার।'

বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কলেজের আর্থিক ও অন্যান্য দায়দায়িত্ব সরকার নেওয়ার পর মনে হতে পারে বেসরকারি উদ্যোগের আর কোনো ভূমিকা নেই। এ ধারণা সঠিক নয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয়

সরকারের অনুদান পেতে গেলে কলেজকে ইউ জি সি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বশাসিত সংস্থা ন্যাক (National Assessment and Accreditation Council)-এর দ্বারা নিজেদের মূল্যায়ন করাতে হয় এবং প্রাপ্ত ফলাফল (গ্রেড)-এর ভিত্তিতে অনুদান পাওয়া যায়। ভালো গ্রেড পাওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষক, ছাত্র, শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অন্যান্যদের ভূমিকাও কম নয়। মূল্যায়নের সময় পরিদর্শক টিম (Peer Team) যেসমস্ত বিষয় দেখে তার মধ্যে একটি হল কলেজের উন্নয়নে প্রাক্তন ছাত্রদের ভূমিকা। এ ব্যাপারে ন্যাক এর প্রত্যাশা সেলফ স্টাডি রিপোর্ট (SSR)-এর ৫.৪ ধারায় বলা আছে: "An active Alumni Association can contribute in academic matters, student support as well as mobilisation of resources both financial and non-financial."

কলেজের পাঠ শেষ করে ভবিষ্যতের পড়াশোনা/ চাকরির সুযোগ সম্পর্কে ছাত্রদের জানার আগ্রহ থাকে। এক্ষেত্রে প্রাক্তন ছাত্ররা বর্তমান ছাত্রদের কাউন্সেলিং করতে পারে। প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠন কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে ছোটোখাটো কোনো নির্মাণকার্য প্রাক্তন ছাত্ররা কলেজকে উপহার হিসেবে দিতে পারে। কলেজে থাকার সময় অনার্স ক্লাসে ছাত্রদের বলেছিলাম: 'এক পিরিয়ড ক্লাসের জন্য তোমরা মাথাপিছু ব্যয় করো এক টাকা, সরকার অর্থাৎ জনসাধারণ ব্যয় করে পাঁচশো টাকা। ভবিষ্যতে চাকরি পেলে সমাজকে কিছুটা ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কোরো।'

একটি শ্রেণি কক্ষ, একটি অফিস ঘর, ৮জন ছাত্র নিয়ে যাত্রা শুরু করে আজকের যে রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয় তা চারাগাছের মহীরুহে রূপান্তর। এর স্বীকৃতিও মিলেছে ন্যাকের মূল্যায়নে B++ গ্রেড পাওয়ার মধ্য দিয়ে। আগামী দিনে আরও উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনা ও সুযোগ আছে। ৩ একর জায়গা নিয়ে কলেজ শুরু হয়। দান এবং স্বল্পমূল্যে ক্রয় বাবদ আরও প্রায় ১১একর জমি সংগৃহীত হয়েছে যার বেশিরভাগটাই একলপ্তে। অর্থাৎ ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনে পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত জমি আছে। প্রয়োজন প্রেরণা, চাই আবেগ। পরাধীন যুগে শিক্ষায়তন গড়ে তোলা ছিল জাতীয় আন্দোলনের কর্মসূচি, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরের ৩/৪ দশক ছিল দেশ গঠনের কার্যক্রম, আজকের বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষায়তন গড়া বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড। এই কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আমাদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় আগামী দিনে উন্নত উচ্চশিক্ষার সুযোগ আরও বেশি বেশি নাগরিকের কাছে পৌঁছে যাক—এটাই হোক সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে আমাদের অঙ্গীকার।

তরুণকুমার মণ্ডল
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়— কিছু স্মৃতিকথা ও সেখান থেকে বর্তমানে উত্তরণ

সময়কাল ১৯৮৫-৮৮। আমি সেসময় রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। অর্থনীতি অনার্স। ওই বছরই কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স চালু। আমরা প্রথম ব্যাচ। চণ্ডীদাস মুখোপাধ্যায় তখন অধ্যক্ষ। বাবার সঙ্গে ওঁর একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। উনি বাবাকে বললেন— 'ছেলেকে এখানে ভর্তি করুন। অর্থনীতির বিরাট ভবিষ্যৎ।' সেইমতো সিদ্ধান্ত। ভর্তি হয়ে গিয়েছিলাম আরামবাগ নেতাজি মহাবিদ্যালয়ে। রসায়নে অনার্স। ছেড়ে দিলাম। অর্থনীতির ক্লাস চালু হল। প্রিন্সিপাল স্যার নিজে, সঙ্গে মোহিনী মান্না, অনিন্দ্য মল্লিক, নারায়ণ সাহা, ইতি মুখার্জি। অনিন্দ্যবাবু পড়াতেন সমষ্টিগত অর্থনীতি। চেষ্টা করতেন নিজেকে উজাড় করে দিতে। মোহিনীবাবু মাইক্রো ইকোনমিকস। বোর্ড ওয়ার্ক অসাধারণ। ছবি ও হাতের লেখা শিল্পীর মতো। নারায়ণবাবুর তুলনা হয় না। প্রকৃত অর্থেই একজন ভালো শিক্ষক। স্ট্যাটিসটিক্স পড়াতেন। বন্ধুর মতো মিশতেন। ইতি দি ভারতীয় অর্থনীতি। অধ্যক্ষ স্যার মার্কসীয় অর্থনীতি। দারুণ পড়াতেন। উত্তরপাড়ায় ওঁর বাড়িতে পড়তে যেতাম। বিনা পয়সায় পড়াতেন। সঙ্গে চানাচুর-মুড়ি-চা। কলেজের পরিবেশ খুব সুন্দর। সামনে বড়ো পুকুর। চারপাশে ঝাউ গাছ। বসার জায়গা। মনোরম পরিবেশ। বিশাল কলেজ বিল্ডিং। সবেমাত্র সায়েন্স বিল্ডিংয়ের কাজ শেষ হয়েছে। সুদৃশ্য। পাশেই প্রকান্ড লাইব্রেরি বিল্ডিং। EPW থেকে শুরু করে নানা ধরনের জার্নাল। প্রচুর বই পত্র। শংকরদা লাইব্রেরিয়ান। বাকিদের নাম মনে নেই। সবাই খুব ভালোবাসতেন। হেল্প করতেন। বড়ো বড়ো ল্যাব। কেমিস্ট্রি, জুলজি, বোটানি, ফিজিক্স। NCC-র তখন খুব রমরমা। দেবপ্রসন্ন বিশ্বাস আমাদের অঙ্ক পড়াতেন। দারুণ ভালো। ছিলেন নবকুমারবাবু। অর্থনীতি অনার্স, অথচ অঙ্কে আমার সত্তর শতাংশ নম্বর। আরও কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন। তাঁরাও খুব ভালোবাসতেন। উপানন্দবাবু, অমলবাবু, নৃপংকরবাবু, নববাবু, অসীমবাবু। শেষের চারজন পরে অধ্যক্ষ। সহকর্মী থেকে ওই কলেজেই অধ্যক্ষ। আমার ছোটো ভাই প্রশান্ত। ছাত্র হিসাবে ওই তালিকায় আমিও। ভালো লাগে কলেজটাকে অধ্যক্ষ গড়ার কারখানা হিসাবে দেখে। ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া। ম্যাগাজিন সেক্রেটারির দায়িত্ব অর্পণ। স্নেহাশিষ রায় তখন ছাত্র নেতা। অসম্ভব ভালো বক্তা। অন্যদিকে রেজাউল করিম সরকার। দারুণ ভালো মানুষ, ভালো সংগঠক। ও আজ আর নেই আমাদের মধ্যে। অতীতের ওই দিনগুলো আজ খুব মনে পড়ে। ভুলতে পারি না।

জাতীয় শিক্ষা নীতির উপর কলেজে একটা বিতর্ক সভা হয়েছিল। আমি প্রথম হই। সে এক আলাদা অনুভুতি। তারপর সাফল্যের সঙ্গে অনার্স পাস করে এম এ পড়তে যাই। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয়। চন্ডীবাবু তখন অধ্যক্ষ। শুনেই কলেজে ছুটি ঘোষণা করলেন। আমাকে কলেজে ডাকলেন। ক্লাসে ক্লাসে পরিচয় করিয়ে দিলেন। স্যার যেভাবে আমাকে ও বাকিদের উৎসাহিত করলেন, সত্যি তা দেখবার মতো। চন্ডীবাবুর মতো যোগ্য, দাপুটে অধ্যক্ষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি। ছিলেন সুবক্তা। তিনিও আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। এরপর এম ফিল। টানা ১৮ বছর হাটগোবিন্দপুর কলেজে অধ্যাপনার চাকরি। তারপরেই ২০১৮-র শেষের দিকে কলেজ সার্ভিস কমিশনের সুপারিশে ভদ্রেশ্বর কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয় এ অধ্যক্ষ পদে যোগ দিই। ভালোমন্দের মাঝেও আমরা সুখের স্বপ্ন দেখেছি। লড়াই করেছি নিজের সঙ্গে। নিজের অন্তরাত্মার সঙ্গে। চূড়ান্ত বিড়ম্বনা, সীমাহীন অস্থিরতা। তবুও মনটাকে শক্ত করে চেষ্টা করেছি কাজ করতে, যে কাজ করার প্রেরণা পেয়েছি স্বর্গীয় অধ্যক্ষ চন্ডীবাবুর কাছ থেকে। বেশিরভাগক্ষেত্রে সফলও হয়েছি। তারপর এক কালো অন্ধকার। আমাদের জীবনের সামনে এক বড়ো মুসিবত। কোভিড ছেয়ে গেছে ভারতে, সঙ্গে গোটা দুনিয়াতে। ভয়াবহ অবস্থা। চারিদিকে মৃত্যু মিছিল। অনেক পরিচিত পরিজনকে হারিয়েছি এই সময়ে। সেসময় আমরা ছিলাম চূড়ান্ত অসহায়। তবুও আগের ওই দুঃখজনক স্মৃতি আমাদের ভুলতে হবেই। কারণ সামনে এক বড়ো রাস্তা। 'দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার'। To quote Taylor:

> The path to realizing our dreams is never smooth. Invariably we encounter bends, turns, detours, and roadblocks. Sometimes our frustrations make us want to give up the journey, but frustrations signal the need to pause for introspection and redirection. Frustrations are promptings from God to search our souls even more deeply to find our power and purpose, and to live it. Frustrations tell us that our thoughts and actions are not yet in harmony with our desires.

Taylor-এর বক্তব্যের এই সারবত্তাকে মেনে নিয়েই আমরা স্বপ্ন দেখেছি এক সুন্দর সন্ধিক্ষণের। আমাদের অঙ্গীকার, হাসিমুখে আমরা এগিয়ে যাব জীবন যুদ্ধে। লড়াই করেই এগোতে হবে। এ লড়াই শেষ নয়, সামনে আরও বড়ো লড়াই। হুটহাট করে প্রায় মনে পড়েছে সেই চিরন্তন সত্যের কথা। সুখ আর দুঃখ একই সূত্রে গাঁথা। কবির কথায়: "Joy and woe are woven fine, A clothing for the soul divine, Under every grief and pine, Runs a joy with silken twine. It is right it should be so Man was made for joy and woe." কবি এরপরে বলছেন—এই সত্যটাকে যদি আমরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে দুনিয়াতে আমরা নিরাপদে বিচরণ করতে পারব। "Safely we can go through the world." দুনিয়াটা গোলাপফুল-এর বিছানা নয় (The world is not a bed of roses)। এই মহা সত্যকে মেনে নিয়ে আমরা এগিয়ে গেছি। জয় করেছি যাবতীয় বাধা ও বিপত্তি। দাঁতে দাঁত চেপে নিয়েছি অনেক সংকল্প, অঙ্গীকার। ঠিক এরপরেই ধীরে ধীরে পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হল। আমরাও নতুন কিছু ভাবতে শুরু করলাম। আমাদের মিশন— ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়ার অভ্যেস গড়ে তোলা। সমান্তরালভাবে শিক্ষকদের এই উদ্যোগে একইভাবে শামিল হওয়া। উদ্দেশ্য একটাই— ওদের উৎসাহ দেওয়া, বইমুখী করে তোলা। আর ভিশন! পাঠক উপযোগী প্ল্যাটফর্ম ও পরিবেশ তৈরি করা। এই অভিনব ধারণাকে ধারণ করে আমরা এগিয়ে চলেছি। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছুটছি আমরা। ডিজিটাল ইন্ডিয়া! অন্তত চেষ্টাটা তো করছি! নব নব উদ্ভাবনের মধ্যেই সৃষ্টি বেঁচে থাকে। টিকে থাকার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। অন্ধকার কূপ। আলো নেই। জল নেই। বাতাস নেই। তাই সেখানে নেই প্রাণের কোনো স্পন্দন।

প্রকৃত আনন্দ থাকে বেঁচে থাকার মধ্যে। এই কারণেই আমরা চাইছি আমাদের সব উদ্যোগকে জীবনমুখী করে তুলতে। আমরা আপ্লুত। একাগ্রতা, নিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠানের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ছাড়া জাতির উন্নয়ন অসম্ভব। আগামী দিনে আরও অনেক পথ আমাদের হাঁটতে হবে। আঁকাবাঁকা পথ। একসঙ্গে অনেক পথ। তার মধ্যে বেছে নিতে হবে অপেক্ষাকৃত ভালোটি। Robert Froster -এর 'The road not taken'— এই সিদ্ধান্তে আসতে গেলেও ওই রাস্তা দিয়ে এগোনোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেই হবে। যাত্রাপথে বিঘ্ন, বিপত্তি আসবে। একসঙ্গে থাকতে গেলে সেটা হয়। অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। তাই, দমলে চলবে না। সব বিপত্তিকে এড়িয়ে এগিয়ে যেতে হবে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। আমরা সবাই কান্ডারির ভূমিকায়। বিজয়ী সৈনিক। জয় আসবেই। Emily Dickinson -এর মন্ত্র "Because I could not stop for death" হোক আমাদের সবার মন্ত্র।।

সালাউদ্দিন খান
অধ্যক্ষ, কবি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়
ভদ্রেশ্বর, হুগলি

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের সাবেকি কথা

তারকেশ্বর থেকে আরামবাগ। রেললাইনের ব্যাবস্থা নেই। পরিবহন বলতে একমাত্র বাসই ভরসা। বর্তমান তারকেশ্বর রেল স্টেশনের উত্তর দিকে ছিল বাসস্ট্যান্ড। খুব একটা নিয়মিত চলত সেটা জোর দিয়ে বলা চলে না। ট্রেনের যাওয়া-আসার উপর নির্ভর করতে হত যাত্রীদের। তাও আবার বর্ষায় তো কথায় নেই। মাঝে দু-একটা জায়গায় ফি বছরই বানের জলে ভেসে যেত রাস্তাটা। তখন ভরসা স্থানীয় পরিভাষায় 'কাটা সার্ভিস'। মাঝখানটা হেঁটে যেতে হত। ফলে খুব দায় না পড়লে বয়স্করা এই রাস্তায় যাতায়াত করতে চাইতেন না। এই রুটেই পড়ে চাঁপাডাঙা। একসময় চলত মার্টিন কোম্পানির ন্যারোগেজ রেল। চাঁপাডাঙা হতে হাওড়া ময়দান, ভায়া শেয়াখালা। ১৯৪৫ সালে পরিকল্পনা হয় মার্টিন কোম্পানি শিয়াখালা থেকে চাঁপাডাঙা পর্যন্ত রেল যোগাযোগ করবে। এলাকায় বসেছিল জুট কর্পোরেশনের অফিস। কাজেই পাট আর আলুর ব্যাবসা চলত রমরমিয়ে। তারকেশ্বর রেল স্টেশন থেকে ৮ কিমি পথ। এ অঞ্চলে তখন দু-একটা সুনামী স্কুল হয়তো ছিল, কিন্তু কলেজ নেই। উচ্চশিক্ষা বলতে একদিকে হরিপাল (১৯৬৪) ও অন্যদিকে আরামবাগ (১৯৪৮)। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে অভিভাবকরা কলকাতার কথা ভাবতে পারতেন।

এসব কথা ষাটের দশকের। তাই এলাকার শিক্ষিত ব্যাক্তিবর্গ, শিক্ষানুরাগী ব্যাবসায়ী মহল, সাথে কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ভাবনা-চিন্তা শুরু করলেন ষাটের দশকের শুরু থেকেই। প্রসঙ্গত কয়েকজনের নাম করাই যায়। তবে ভয়টা অন্যত্র। অনেকের নাম বলা হবে না। তাতে মনক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণটা উপেক্ষা করার নয়। স্থানীয়দের মধ্যে অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক, প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল, নিতাই চন্দ্র অধিকারী, পাঁচকড়ি পাল, কাশীনাথ মণ্ডল, প্রসাদচন্দ্র মণ্ডল, মনীন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ ব্যাক্তিত্ব প্রথম সারিতে রইলেন। এর সাথে বহু শুভানুধ্যায়ী একসাথে যুক্ত হয়েছেন। শুরু করেছেন সম্মিলিত প্রয়াস। অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। যাঁদের নাম মহাবিদ্যালয়ের দেওয়ালে স্মৃতিফলকে রয়েছে। স্থান নির্বাচন একটা জরুরি শর্ত। অনেকেই ভাবনা-চিন্তা করে চাঁপাডাঙার নিতাই চরণ হাজরার স্মরাণাপন্ন হলেন। তিনি নিঃসন্তান। তাঁর ঢ্যাঙপাড়ায় একটি পুকুর আছে। চারপাশে কলাগাছ আর একটি কুঠীবাড়ি। সবমিলে ৩০৭ শতক পরিমাণ জায়গা। তাঁকে এলাকার সমস্যাটি বোঝানো হল। সর্বসাকুল্যে তাঁর সমগ্র জমটি দান হিসাবে গ্রহণ করা হল। অনেকটা পরিমাণ আর্থিক সহায়তা (৪০,০০০/-) পাওয়া গেল তাঁর কাছে (ফলকে উল্লেখিত ফেলুবালা দাসী সহ)। তিনি কিন্তু কলেজের পত্তন দেখে যেতে পারেননি। ডোবা পুকুরের চারপাশে মাটি নিয়ে একটা ইটভাঁটাও তৈরি হল। পুকুর বাড়তে লাগল, তবে চার-পাড়

পরিষ্কার নয়, সুষম নয়। পুকুরের উত্তর পাড়ে লম্বা বারান্দা রেখে একটানা ছয়টি ঘরের ভিত দেওয়া হল। বামদিকে চারটি ঘর তৈরি হল। মাঝে চওড়া সিঁড়ি রেখে ডানদিকে দুটি ঘর। ডানদিকের অংশ অসম্পূর্ণ, দরজা-জানালা বসেনি। বর্তমানের হল ঘরটি তখন ল্যাবরেটারি সহ ছিল। আমাদের আমলে অনেক পরে পার্টিশন দেওয়া হয়েছে।

১৯৭১ এর ৮ নভেম্বর (৯+২৩) ৩২ জন ছাত্র নিয়ে দুটি ক্লাস চালু হল। একটি 'বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা' (University Entrance), অপরটি বাণিজ্য পাসকোর্স (B. Com(p)। বামদিকের চারটি ঘর নিয়ে শুরু হল উচ্চশিক্ষার আলোক সন্ধানে শত শতাব্দীর আশা জাগরণের প্রচেষ্টা। আজকের ১নং কক্ষটি ছিল অফিস, ঘরের মাঝে পূর্ব-পশ্চিমে পর্দা টাঙানো হল। দক্ষিণদিকের অংশে অধ্যাপকরা বসছেন, উত্তরদিকের অংশে করণিক বসছেন অফিস সাজিয়ে। আয়রণ চেষ্ট বলতে 'ননদ প্যাটারীর' গোলাপ ফুল আঁকা সুটকেস। তখন স্টিলের সুটকেস বাজারে ওঠেনি। করণিকের পাশে আছে ফুট পাঁচেক উঁচু একটা কাঠের আলমারি। ওর একটা অংশে অফিসের কাগজপত্র, একপাশে কিছু সংগৃহীত পাঠ্য বই, মহাবিদ্যালয়ের প্রথম আনুষ্ঠানিক লাইব্রেরি। তারই একপাশে ওই বর্তমান কক্ষে তৈরি হয়েছে একফালি প্রস্রাবাগার। ছাত্রদের জন্য অবারিত মাঠ। শুরু হল পড়াশোনা। সে দিনের সেই মুহূর্তে যাঁরা পড়ালেন তাঁদের কেউই এই কলেজে স্থায়ী পদে আসেননি। প্রায় সপ্তাহ দুয়েক এইভাবে চলতে লাগল। ইতিমধ্যে বাণিজ্য, বাংলা ও ইংরেজি এই তিন বিষয়ে মোট চারজন আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিলেন। প্রত্যকেই এলেন জীবনকে বাজি রেখে। কলেজের অনুমোদন নিয়ে আশা রইল তবে ভরসা কই। ছাত্রগুলি কী ভরসায় ভর্তি হয়ে গেল বাবা তারকনাথই জানতেন। দ্বিতীয় বছরে U.E-তে দু-একজন ছাত্রী ভর্তি হল। তবে ১৯৭৩ সালে কলাবিভাগ চালু হওয়ার আগে বাণিজ্য বিভাগে ছাত্রী ভর্তি হয়নি। শুরু হল কর্মযজ্ঞ। দু-একজন শিক্ষাকর্মী এলেন, তাঁরা দিনে কলেজ করছেন, রাতে আলুপটিতে চলতি লড়ি থেকে দু-টাকা করে 'শিক্ষাবৃত্তি' তুলছেন। শিক্ষকরা সামান্য হাত খরচ পাচ্ছেন আর স্থানীয় একজন শুভানুধ্যায়ীর ব্যাবসার 'টাটে' দুপুরে খেয়ে নিচ্ছেন। ওটাই আয়ের সংগতি।

বাসস্ট্যান্ডে নেমে বাঁধ ধরে হেঁটে এসে তেঁতুলতলা পেরিয়ে কলেজের দিকে নামলে আজও আছে সেচ বিভাগের বাংলো। আমরা যখন দেখেছি, চারপাশে দেওয়াল ছিল না। বামদিকের মাঠে ছিল মার্টিন রেলের 'চাঁপাডাঙা' স্টেশন। ১৯৭০ এর শেষদিকে 'ডেথ সার্টিফিকেট' পেয়ে গেছে। কলেজের জন্মলগ্নে তখনও তার বডি পার্টস পড়ে আছে। দু-একটা ইঞ্জিন, পাতা রেললাইন, পরিত্যক্ত রেল কোয়ার্টার যেগুলো চলে গেছে অন্য কারও জিম্মায়। সেই বিরাট স্টেশন চত্বর আজ বেদখলের খাতায়। সেচ বাংলোর একটা পুরোনো মেহগিনি গাছ একজন কাঠ ব্যাবসায়ীকে দিয়ে কেনার ব্যাবস্থা করা হল। শর্ত একটাই তিনি গুঁড়ি নেবেন, আর ডালপালা গুলো কলেজের স্বার্থে দান করবেন। সেই দিয়ে বানানো হল কয়েকটি বেঞ্চ ও কয়েকটি কাঠের চেয়ার। হাজার হলেও মেহগিনি, নাই বা হল '২৪ক্যারেট'।

প্রথমবারের একজন ছাত্র ভরত মেটে, সে বছর বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাধারণ রেজাল্ট করে বসল। U.E-তে থার্ড হল। আর যায় কোথায়, কলেজ কর্তৃপক্ষের উৎসাহ দ্বিগুণ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অর্জন করা গেল। প্রসঙ্গত বলে রাখি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনে কলেজ চালু হত। এরপর রাজ্য সরকারের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মতি গেলে তবেই শিক্ষকদের বেতন অনুমোদিত হত। আমাদের

কলেজ রাজ্য সরকারের কাছে 'আণ্ডারটেকিং কলেজ' হিসাবে স্বীকৃত হল। সাথে সাথে অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। বলাবাহুল্য সেদিনের প্রত্যেকটি নিয়োগই মৌখিক ও 'বিশুদ্ধভাবে অস্থায়ী'। ইতিমধ্যে কয়েকজন শিক্ষক কাজের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে স্থানীয় অন্য প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদে যোগ দিয়ে দিলেন। শুরুর দিকে অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ সরকার টিচার-ইন-চার্জ হিসাবে দায়িত্বে ছিলেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে টিচার-ইন-চার্জ হলেন উপানন্দ রায়, যেহেতু তিনিই ছিলেন প্রথম নিযুক্ত অধ্যাপক। উনি এসেছিলেন কলেজ শুরুর ১৭-১৮ দিন পর।

এরপর কলেজ কর্তৃপক্ষ বেছে নিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্যকে। উনি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। এনার আমলে মহাবিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক সহ প্রায়ই স্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান শিক্ষকেদের কাছে যাওয়া হত প্রচারের জন্য। এর মাধ্যমে অভিভাবকরা ভরসা পেতে শুরু করলেন।

৮ নভেম্বর ১৯৭১ থেকে 'আণ্ডারটেকিং'-এর অভিশপ্ত অধ্যায় পুরোপুরি তিন বছরের জন্য ভোগ করতে হল না। এই সময়ে শর্ত থাকে কর্তৃপক্ষ যদি এই তিন বছর নিজস্ব খরচে কলেজ পরিচালনা করতে পারে তবেই সরকার অধিগ্রহণ করবে। কিন্তু ০১.০১.৭৪ অর্থাৎ ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারি থেকেই সরকার, 'সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ' হিসাবে অধিগ্রহণ করল। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের দীর্ঘশ্বাস ফেলার দিন শেষ। 'উঠিল বিশ্বে সে কী কলরব, সে কী মা ভক্তি, সে কী মা হর্ষ'। পরে অবশ্য ১৯৭৭-এ সরকার পরিবর্তন হলে ০১.০১.৭৩ থেকে অনুমোদন দিয়ে দিল। ১৯৭৯ সালের শেষ দিকে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় অধ্যক্ষের দায়ত্বভার গ্রহণ করলেন। সত্যিকারের একজন কর্মযোগীর যেন অভাব ছিল এতদিন।

তিনি প্রথমেই জিলা পরিষদে যোগাযোগ করে অহল্যাবাঈ রোডের দায়িত্ব যাতে জিলা পরিষদ নিয়ে কলেজ পর্যন্ত আমূল সংস্কার করে, সেটি মঞ্জুর করালেন। এর আগে রাস্তাটি কমবেশি চার ফুটের বেশি চওড়া ছিল না। ছাত্র-শিক্ষকরা কলেজে আসছে চাঁপাডাঙা বাজার ছাড়িয়ে বামদিকের কবরখানার সামনের আলপথে। মাঠের উপর দিয়ে সোজা আসত ক্যানাল পাড়ে। জিলা পরিষদ কলেজের সামনের অশ্বত্থতলা পর্যন্ত ভোল পালটে দিল। ঢ্যাংপাড়া পেরিয়ে পুরোনো মার্টিন রেলপথেই আজ অহল্যাবাঈ রোড নামে জাঙ্গিপাড়া পর্যন্ত সুন্দর রাস্তা হয়েছে।

কলেজে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যাবস্থা করলেন। বাণিজ্য বিভাগে সাম্মানিক স্তর পর্যন্ত চালু করলেন। হাত দিলেন বিজ্ঞান বিভাগ চালু করার পর বিজ্ঞান ভবন নির্মাণের। চোখের সামনে দেখেছি বিজ্ঞান ভবন উঠছে চোখের সামনে আস্তে আস্তে। উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ প্রবর্তন করে পাস কোর্স, অনার্স কোর্সের ব্যাবস্থা করলেন। কলা বিভাগে বাংলা, ইংরেজিতে অনার্স, ইতিহাস, অর্থনীতি ও দর্শন বিভাগে অনার্স চালু হল। সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বহু কৃতি অধ্যাপক আসতে শুরু করলেন। কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কীভাবে বৃদ্ধি পেল তা অকল্পনীয়।

ত্রিতল বিজ্ঞান ভবনের পর শুরু করলেন পাঠাগার ভবন। মধ্যে পাঠাগার অনেকটাই বৃদ্ধি পাওয়ার

দরুন স্থানান্তরিত হয়েছিল বর্তমান ১নং কক্ষের উপরের কক্ষটিতে। এই অবসরে ১নং কক্ষটি পুরোটাই ক্লাসের জন্য ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে খোলা হয়েছে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নে অনার্স কোর্স। সংস্কৃত ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স কোর্স। নির্মিত হয়েছে জিমনাসিয়াম বিল্ডিং। চালু করেছেন NCC ও NSS এর শাখা। প্রতিবছর উৎসাহিত ছাত্ররা NCC-তে যোগ দিয়ে 'B' ও 'C' certifificate আজও অর্জন করে। মাইক্রোবায়োলজিতে অনার্স চালু হল। যদিও এই কোর্সটি self- financing mode-এ চালু হয়েছে। এলাকায় গরিব ছাত্রদের জন্য remidial teaching এর grant আদায় করে আনলেন। স্বনির্ভর প্রকল্পের জন্য মেয়েদের সেলাই শেখার ব্যাবস্থা হয়েছে। মাদুর বোনার ব্যাবস্থাটি চালু হয়ে বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণ যে ছাত্রদুটি সামান্য ভাতার বিনিময়ে কলেজে শেখাতে আসত, তারা চাকুরিতে নিযুক্ত হয়ে গেল। উৎসাহে ভাঁটা পড়ল। এই কর্মদ্যোগী মানুষটি কলেজে প্রথম ছাত্র সংসদের ব্যাবস্থা করেছিলেন। এর ফল সবটাই শুভ তা হয়তো বলা যাবে না। কিন্তু ছাত্রদের সমাজ ও রাজনৈতিক স্বচেতনার দিকটি তাঁর হয়তো নজর এড়ায়নি। মানুষটির সাথে মত বিনিময়ের সময় মতান্তর বা মনান্তর ঘটত না এটা জোর দিয়ে বলার জায়গায় আমি নেই। তবে একথা অনস্বীকার্য যে কলেজে প্রতিটি কর্মীর সাথে মনান্তর বাড়তে দিতেন না। ব্যক্তিপূজা আমি সমর্থন করি না, কিন্তু একটি মানুষের কৃতিত্বকে ছোটো করে দেখার অধিকার হাতে তুলে নেওয়া অনুচিত। ১৯৯৯ এর মে মাস নাগাদ তাঁর অবসর গ্রহণের পর ১৯৯৯ এর ডিসেম্বর মাসে দায়িত্ব নেন ডঃ তরুণ কুমার মণ্ডল। তাঁর আমলে কলেজ অফিস, লাইব্রেরি প্রত্যেকটিতে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ব্যাবস্থা চলু হয়। কলেজ ভর্তি থেকে শুরু করে হিসাব সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তির অঙ্গ হিসাবে কম্পিউটার নির্ভর করা হল। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয়, দুবার NAAC (National Assesment and Accredatation Council) মূল্যায়ন হয়েছে। এ বিষয়ে যে বৃষোৎসর্গ যজ্ঞ চলে তা কলেজের সাথে যাঁরা যুক্ত ন্ তাঁরা সহজে বুঝতেন না। অধ্যাপক মণ্ডলের আমলেই চালু হয়েছিল রাশি বিজ্ঞানের পাস কোর্স। এরপর আসছে বর্তমান ব্যবস্থা, যে বিষয়ে একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসাবে আমার অভিজ্ঞতা নিতান্তই অল্প। পরিশেষে বলা যায় এই মহাবিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে ছিল স্থানীয় মানুষের কায়িক ও আর্থিক সহযোগিতা, একটা সার্বিক প্রতিশ্রুতি, যার ফলশ্রুতি হিসাবে এই শিক্ষাঙ্গনটি হয়ে উঠেছে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' প্রতিষ্ঠান।

দেবপ্রসন্ন বিশ্বাস
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, গণিত বিভাগ
রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

ফিরে দেখা

সময়টা সেই ১৯৯৬ সাল। কলেজে ভর্তি হওয়ার এক অদম্য ইচ্ছে আর উত্তেজনা আরও পাঁচজনের মতো আমাকেও ঘিরে ধরেছিল। ইংরেজিতে অন্যান্য বিষয়ের থেকে বরাবর একটু বেশি নম্বর পাওয়াতে আর আগাগোড়া ভালোলাগার কারণে, এই বিষয়েই অনার্স নেওয়া একেবারে মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু বরাবরের ইচ্ছে ছিল শ্রীরামপুর কলেজে পড়াশোনা করার। এত বড়ো বিখ্যাত কলেজে পড়ার ইচ্ছে কার-ই-বা না থাকবে। ভর্তির জন্যে আবেদন পত্র জমা দিলাম, যথাসময়ে মেরিট লিস্টে নাম বেরিয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। কিন্তু ইতোমধ্যে চাঁপাডাঙায় অবস্থিত এই রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে সরাসরি ভর্তি হয়ে গেলাম। বাসস্ট্যান্ড থেকে মিনিট পঁচিশ হেঁটে আসতে হত কলেজে। সময়টা আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগে। রিকশা ছাড়া আর কিছু চলত না। স্যার-ম্যাডামদের দেখেছি রিকশা করে যাতায়াত করতে। ভর্তি হয়ে প্রথম প্রথম ভাবতাম এতটা রাস্তা কীভাবে যাব! আস্তে আস্তে সেই পথটি কেমন অল্পই মনে হতে লাগল। সব বন্ধুরা মিলে হইহই করে দল বেঁধে যেতাম কলেজে। শহরের কোলাহল থেকে দূরে সবুজে ঘেরা গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে কলেজ। অনেক বড়ো ক্যাম্পাস। সারি সারি গাছ। মাঝখানে বেশ বড়ো একটি পুকুর। তারই চারপাশে আমরা বন্ধুরা মিলে আড্ডায় মাততাম। কখনো কাউকে নিয়ে খুনসুটি কখনো বা ডান, মারভেল, বা শেকসপিয়রের রচনা নিয়ে চলত আলোচনা। কলেজে উঠে সেই প্রথম ইংরেজিতে প্রেমের কবিতা পড়ে শিহরণ হত আমাদের সেই সময়ের নরম মনে। সেই সময়ে আমাদের ছিল না কোনো মোবাইল, না ছিল হোয়াটসঅ্যাপ। ক্লাসের মাঝে কোনো অফ পিরিয়ড থাকলে আমাদের চলত অনেক আড্ডা। ইংরেজি বিভাগের সুকৃতি বাবু, অশোক বাবু, সি ডি স্যার এঁদের ক্লাসের জন্যে আমরা মুখিয়ে থাকতাম। তিনটে বছর ইংরেজি সাহিত্যে হাতেখড়ি শুরু হল এঁদের আন্তরিক তত্ত্বাবধানে। এই কলেজেই শুরু হল উচ্চশিক্ষার সহজপাঠ। আধুনিক শিক্ষণসহায়ক কোনো গ্যাজেট ছিল না। তবুও সেরকম কোনো অভাব অনুভব হয়নি, আজকে অনেকদিন পরেও সেই অনুভূতি আমার। মফস্সলের ছাপ ছিল কলেজের সর্বত্র। শহুরে চাকচিক্য ছিল না। তা সত্ত্বেও পঠনপাঠনে কোনো অভাব বোধ করিনি। বন্ধুদের সাথে চলত অনাবিল আড্ডা, আজকের মতো শিক্ষকদের সাথে সহজ সম্পর্ক হয়নি। কিন্তু তাঁরা আমাদের ভালোবাসতেন, প্রকাশ ছিল না হয়তো আজকের মতো। কিন্তু এখনও তাঁদের সাথে যোগাযোগ রয়ে গেছে। পরম স্নেহের স্পর্শ পাই দেখা হলেই। একইভাবে সেইসব বন্ধুরা আজকে সামাজিক মাধ্যমে আবারও কাছে এসেছি ভার্চুয়াল স্পেসে। কলেজ সেই যোগসূত্র তৈরি করে দিয়েছে। আবারও কোনোদিন একসাথে মিলিত হব। দেখা হবে। জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে আছে সেই কলেজ— আমাদের প্রিয় রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়। গ্রামের কলেজ— এতেই আনন্দ, এতেই আমদের গর্ব।

সুকান্ত দাস
প্রাক্তন ছাত্র, ইংরেজি বিভাগ (১৯৯৬-১৯৯৯)

এভাবেও ফিরে আসা যায়

টুংটাং শব্দের ট্রাম, ধোঁয়া ওঠা চায়ের ভাঁড়, গঙ্গার ধার, আড্ডার ক্যাম্পাস—এই কল্পনাগুলো যখন চোখে স্বপ্ন নামক একটা আভার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে থাকে, তখন অনেকেই আমরা ভাবি না এগুলো খুব অলীক কিছু, অবান্তর কিছু, অন্যায্য কিছু। যদিও আরও অনেক গল্পের ভিলেনের মতোই একটা 'কিন্তু' এসে হাজির হয় এরপর। ব্যক্তি বিশেষে এই কিন্তুর কারণগুলো নানা সজ্জায় সজ্জিত হয়, তাদের বিবিধ মত-পথ নিয়ে। তার যোগফল আর-যাই-হোক, খুব যে একটা মোলায়েম হয়, এরম বলা যায় না।

আমি, আমরা যখন তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত ছোট্ট গ্রাম বিনোদবাটি ছেড়ে কলকাতা নামক এক জাদু-বাস্তবতায় প্রবেশ করি তখন লকডাউন পরবর্তী জীবন মাস্কের ফাঁক দিয়ে সবে শ্বাস নিতে শুরু করেছে দুরু দুরু বুকে। তারপর? তারপর এ শহরের অটোর ভাড়া, সবজির দর আর ক্রসিং-এর হলুদ,সবুজ, লাল সংকেতের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে হতেই দেখি পেরিয়ে গেছে অনেকটা সময়। এমন সময় ডাকটা এল। বাড়ি ফেরার ডাক!

আমার কলেজ 'রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়' তার সুবর্ণ মুহূর্তে এই 'প্রাক্তনী'-কে শামিল হওয়ার ডাক দিয়েছে! আহ্লাদে আটখানা, হাতে চাঁদ পাওয়া, জটায়ুর সেই— 'স্তব্ধভাষ, রুদ্ধশ্বাস, বিমুগ্ধ বিমূঢ় বিস্ময়' ইত্যাদি প্রভৃতি এজাতীয় যা যা কিছু আছে, সেসব জড়ো করে একটা বড়োসড়ো স্তূপ খাড়া করে ফেলা যায় আমার সেদিনের অনুভূতির বর্ণনায়। একদিন যে পরিসর আমার সর্বক্ষণের পরিচয় ছিল, সেখানে অতিথির নিমন্ত্রণপত্র হাতে সৌজন্যের কুশল বিনিময় করতে আসা যত গৌরবেরই হোক-না-কেন, আমার পক্ষে সেটা মেনে নেওয়া একটু কষ্টেরই ছিল। এখানেও আমার কলেজ আমায় নিরাশ করেনি। সে আমাকে ডাক পাঠিয়েছিল শুধুমাত্র অতিথি হিসেবে নয়, বরং তার ঘরের মেয়েকে এই মহাযজ্ঞের এক ছোট্ট দায়িত্ব সামলানোর আবদার নিয়ে। না-চাইতেও চোখের কোল ভিজে উঠেছিল, অজান্তেই!

আমাদের কলেজ বরাবরই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নতুন কিছু ভেবেছে, শিখিয়েছে। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। এবং সেই কারণেই নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বইমেলার পাশাপাশি সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি লিটিল ম্যাগাজিন প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। তারই সঙ্গে একটি অভিনব প্রতিযোগিতার পরিকল্পনাও সংযুক্ত করেন সুবর্ণ জয়ন্তীর আয়োজক কমিটি। হঠাৎ লিটিল ম্যাগাজিন বা পত্র-পত্রিকার প্রদর্শনীই কেন? এই প্রশ্ন শহুরে জল-হাওয়ায় অভ্যস্ত যে-কেউই করতে পারেন, কিন্তু আমাদের প্রতিযোগীদের প্রথম প্রশ্ন ছিল— 'পত্রিকা কী'?

পত্রিকার এই প্রদর্শনী চলেছিল দু-দিন ধরে। সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উদ্যাপনের তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে। দু-দিনের এই অনুষ্ঠানকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করা হয়। পত্রিকার প্রদর্শনী, বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের জবানিতে পত্রিকা সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তা, এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে সবথেকে মজার

এবং সম্ভবত সবথেকে জটিল ছিল এই শেষোক্ত প্রতিযোগিতার বিষয়টি। সাধারণত যে-কোনো প্রদর্শনীতে কয়েকজন অভিজ্ঞ উপস্থাপক থাকেন, যাঁরা ওই প্রদর্শিত বস্তু সম্পর্কে দর্শকদের অবগত করেন। কিন্তু আমাদের পত্রিকার উপস্থাপক ছিল 'রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়'-এরই কয়েকটি উজ্জ্বল মুখ। যারা পত্রিকা ছুঁয়ে দেখা তো দূর, পত্রিকা কাকে বলে এই ভাবনার সঙ্গেই সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল তখন।

এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ও পরিচালনার দায়িত্বে কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের কলেজেরই আরও দুজন প্রাক্তনী (ঘটনাচক্রে একজন আমার সহোদরা নাসরিন, অন্যজন আমার বন্ধু সুমনা) এবং আমাকে নির্বাচন করেন। এ কারণে আমি তাঁদের কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব! এই ডাক না এলে অতিমারীর মতো এক আতঙ্কিত অধ্যায় যে আমরা সত্যিই অতিক্রম করে উঠেছি—সে উপলব্ধিতে পৌঁছোতে আমার আরও বেশ কিছুদিন সময় লেগে যেত।

এখন বুঝি, আজন্মের পরিচিত পরিমণ্ডল ছেড়ে বাইরে বেরোলে অচেনার আড়ষ্ঠতা, অনভিজ্ঞতার অকস্মিকতা যেমন নির্দয়ভাবে আঘাত করে, তেমনি আবার এর নিরাময় খুঁজে নিতেও সে নিজেই সাহায্য করে। বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় এসে 'তৃতীয় পরিসর'-এর সঙ্গে যখন সংযুক্ত হই, ভাবতেও পারিনি একদিন এই পরিসরের দৌলতেই গ্রাম, মফস্সল, শহর পেরিয়ে সারা ভারতবর্ষের অজস্র বাংলা পত্র-পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে যাব আমি! 'তৃতীয় পরিসর'-এ তখন আমার কাজ ছিল এবং আজও আমার কাজ পত্রিকা, শুধুমাত্র পত্রিকা নিয়েই। এই কাজেও আমায় সবসময় সহযোগিতা করেছে নাসরিন ও সুমনা।

বলাই বাহুল্য এই আমন্ত্রণ আমাদের সেই অভিজ্ঞতাকে অনেক মানুষের সামনে উপস্থাপন করার একটা মস্ত সুযোগ এনে দিয়েছিল। আমাদের প্রথম দায়িত্ব ছিল প্রতিযোগী ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া। পরিকল্পনা মোতাবেক মূল অনুষ্ঠানের বেশ কিছুদিন আগে আমরা তিনজন উপস্থিত হই আমাদের ছাত্র-জীবনের বহু আনন্দমুখর উদ্যাপনের সঙ্গী ৪৮ নম্বর রুমে। ২২-২৩জন ছাত্র-ছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল প্রায় প্রত্যেকটা দিনকে উৎসবে পরিণত করে তোলা উচ্ছ্বলতায় ভরপুর আমার বন্ধুদের কথা! আমার স্বল্প অভিজ্ঞতা থেকে এবং সাধ্যমতো পড়াশোনা করে পত্রিকা সম্পর্কিত একটা নাতিদীর্ঘ লেখা প্রস্তুত করে রেখেছিলাম, আগেরদিন রাত জেগে। জানতাম এতদিন পর পুরোনো ক্লাসরুমে ফিরে আবেগের দলা গলায় আটকাবেই, তাই আবেগপ্রবন স্মৃতির উপর কোনোরকম ভরসা করার রিস্কই নিইনি (তবে সত্যি কথা বলতে কি ওদের জন্য এই প্রস্তুতি আমার পত্রিকা সম্পর্কিত ধারণাকে আরও স্পষ্ট করে তুলতে সাহায্য করেছিল অনেকাংশে)।

সেদিনের আলাপ-আলোচনার শেষে নির্বাচিত ২০-২২টি পত্রিকা সকল প্রতিযোগীর হাতে একটি করে তুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কাকে কোন পত্রিকা দেব, তাই নিয়েও একটা খুঁতখুতানি চলছিল আমাদের মধ্যে। লিটিল ম্যাগাজিনের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন এর প্রত্যেকটি সংখ্যা একে আপরের থেকে প্রায়শই আলাদা হয়ে থাকে। এই বৈচিত্র্য ছোটো পত্রিকার অন্যতম দস্তুর। সেই মতো আমাদের নির্বাচিত ২০-২২টি পত্রিকার কোনোটা বিশাল বপু, তো কোনোটা নেহাতই রোগাসোগা। কোনোটার দাম ৫০টাকা তো কোনোটা ৫০০। কোনো সংখ্যা সদ্য প্রকাশিত তো কোনোটা একটু পুরোনো। এমতবস্থায় আমাদের নির্বাচন অনুসারে পত্রিকা ওদের হাতে তুলে দেওয়ার একটা খুবই সূক্ষ্ম ঝুঁকি ছিল।

পত্রিকা বিষয়টার সঙ্গে আলাপ না-থাকায় একদম নতুন এই জিনিস হাতে পেয়ে তার রূপ, রং, অবয়ব পছন্দ না-হলে ওদের প্রতি আমরা পক্ষপাত করেছি, এরম অভিমান হতেই পারে এই আমাদের তরুণ সেনাদলের। তাই নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে পুরোদস্তুর প্ল্যানমাফিক লটারির আয়োজন করা হয়। যার হাতের কাগজে যে পত্রিকার নাম উঠবে, তাকে সেই পত্রিকার উপস্থাপন করতে হবে।

শর্ত ছিল প্রত্যেকে লটারিতে পাওয়া ওই পত্রিকাটা পড়ে তাদের ধারণা ও মতামত গুছিয়ে রাখবে প্রতিযোগিতায় উপস্থাপনের জন্য। অর্থাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের আস্ত একটা পত্রিকা পড়ে ফেলতে হবে শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে তত্ত্ব-তালাশ করে জেনে ফেলতে হবে এর বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব, বইয়ের থেকে পত্রিকা কোথায় আলাদা, এর ভাবনাদর্শের স্বাতন্ত্র্য, রাজ/নীতি ও আনুষাঙ্গিক আরও নানান খুঁটিনাটি। এবং এখানেই শেষ নয়, তাপর প্রদর্শনীর দু-দিন একাধিক উপস্থিত দর্শক ও পরিদর্শকদের ওই পত্রিকার ভালো-মন্দ, চরিত্র, গুণাবলি, এবং সে সম্পর্কে তার উপলব্ধি সংক্ষিপ্ত, যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিযোগীদের মধ্যে যে তিনজনের উপস্থাপন পরিদর্শকদের বিচারে উৎকৃষ্ট নির্বাচিত হবে, তাদের পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। বাইরে থেকে শুনে যে-কেউ হয়তো ভাবতে পারেন—এসব ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেশারাইজড করা ছাড়া আর কিছুই না, কিন্তু একটু গভীরে গিয়ে দেখলে দেখা যাবে ছাত্র-ছাত্রীদের একদম আনকোরা একটা বিষয় শেখানোর এহেন আকর্ষণীয় পন্থার উদ্ভব ছাত্রদরদী হৃদয় ছাড়া কখনোই সম্ভব নয়। ছাত্রজীবনে আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই গুণের পরিচয় বহুবার পেয়েছি, 'প্রাক্তনী' হয়ে যাওয়ার পরও সুবর্ণ জয়ন্তীর সোনালি মুহূর্তে তাঁদের এই নীরব প্রচেষ্টায় আবারও অভিভূত হওয়া ছাড়া উপায় রইল না!

মাঝে কয়েকটা দিন উৎসাহে প্রায় দৌড়ে চলে গেল। অনুষ্ঠানের দিন নাসরিন ও সুমনার তত্ত্বাবধানে ৪৮ নম্বর হল জুড়ে সাজানো হল প্রায় শতাধিক পত্রিকা ('তৃতীয় পরিসর'-এর কয়েক বছরের পরিশ্রমের ফসল)। একদিকে সার দিয়ে প্রতিযোগীর দল, তাদের নির্দিষ্ট পত্রিকা আর মুখে একরাশ উৎসাহ নিয়ে। প্রথমেই আমাদের আমন্ত্রিত তিন বক্তা তাঁদের পত্রিকা সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তার নানান দিককে যত্নের সঙ্গে তুলে ধরলেন। তাঁদের মনোজ্ঞ আলোচনা সুবর্ণজয়ন্তীর উদ্যাপনে নতুন মাত্রা যোগ করে। সেদিন অনুষ্ঠান যে কী পরিচালনা করেছিলাম কে জানে, তাঁদের গুণেই আমার ত্রুটিগুলো ঢাকা পড়ে যাচ্ছে এটুকু উপলব্ধি করে খানিক স্বস্তি পাচ্ছিলাম, এই যা রক্ষে। আলোচনার শেষে তাঁরা ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রদর্শনী, সময় নিয়ে শুনলেন প্রতিযোগীদের উপস্থাপনা। তাঁদের বিবেচনা ও আমার ছোটোছোটো ভাই-বোনেদের প্রথম পরীক্ষার ফলাফল সেদিনের মতো অজ্ঞাত রাখা হল।

দ্বিতীয় দিনও আমাদের তিনজন অতিথি, তিন পত্রিকার সম্পাদক, তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিলেন। আলোচনার শেষে প্রশ্নোত্তরপর্বও চলল সমান উৎসাহে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেনি এমন বহু ছাত্র-ছাত্রীও উপস্থিত ছিল সেদিনের আলোচনায়। এছাড়াও কলেজের বর্তমান/প্রক্তন ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক, অভিভাবক এবং আরও অনেকে খুবই উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে দেখলেন পত্রিকার-প্রদর্শনী। রাস্তার ধকল এবং দীর্ঘ আলোচনার ক্লান্তি উপেক্ষা করে অতিথি-বক্তারা কথা বললেন প্রত্যেক প্রতিযোগীর সঙ্গে। প্রথমদিনে সামান্য যা জড়তা ছিল, এদিন তার বিন্দুমাত্র ছাপও দেখা গেল না আমাদের উপস্থাপকদের সপ্রতিভ উপস্থাপনায়! প্রতিযোগিতার নিয়ম মেনে কাউকে বেশি, কাউকে কম নম্বর দিতে বাধ্য হলেও

আমাদের অতিথি-পরিদর্শকদের একাধিকবার বলতে শোনা গেল— 'পত্রিকা নিয়ে এতজন ছাত্র-ছাত্রীদের এত উৎসাহ সচরাচর দেখা যায় না'।

প্রদর্শনীর আরও একটা বিষয় আমাকে ভীষণভাবে অভিভূত করেছিল! এখানে তার উল্লেখ না করলেই নয়। প্রদর্শনীর ২০-২২জন প্রতিযোগীর মধ্যে প্রায় ১৫-১৬জন মেয়ের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ (নিতান্তই স্বাভাবিক এই দৃশ্যপট কেন যে আজও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, তার কারণ সবাই জানেন)। তখনও বিজয়ীদের নাম ঘোষণা হয়নি, ওরা কয়েকজন আমাকে ঘেরাও করে জানতে চাইছিল— 'দিদি আমার বলা কেমন হয়েছে'? 'সবার উপস্থাপন-ই খুব খুব ভালো হয়েছে' বলাতে ওরা খানিক মনঃক্ষুণ্ণ হল। হয়তো ভাবছিল— 'দিদি মন রাখতে বলছে শুধু'! আমি যে একবিন্দু বানিয়ে বলছি না—এই নিপাট সাদা কথাটা ওদের বোঝানোর মতো কোনো উপায় সেদিন এই হতভাগ্যের মাথায় আসেনি।

বিজয়ীর উপহার হয়তো তিনজনের হাতেই শোভা পেয়েছিল, কিন্তু আমার চোখে সেদিন ওরা সবাই বিজয়ী ছিল! 'ছেলেকে তো এবার কাজে পাঠালেই পারো, পড়াশোনা করে এমনিতেও তো কিছু হবে না', 'কন্যাশ্রীর টাকা ঢুকে গেছে, আর কলেজে গিয়ে ওড়াউড়ি করতে হবে না' এই ধরনের অজস্র বিরুদ্ধ বাস্তবতার বাতাস কেটে কেটে যাদের সাইকেল প্রতিদিন কলেজ প্রাঙ্গণের মাটি ছোঁয়, তাদের বিজয়ী ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে, আমার অন্তত কোনো ধারণা নেই!

এর বেশি কিছু বলতে গেলে বড়োই বাড়াবাড়ি শোনাবে হয়তো। কিন্তু না-বলে উপায় নেই যে, আমাদের কলেজ 'রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়' তার সুবর্ণ জয়ন্তী শুধুমাত্র পালন করে দায় সারেনি বরং তা যাপন করেছে নিজের সামর্থ্য ও সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে। রোজনামচার বাঁধন ছিঁড়ে অসম্ভবে বিশ্বাস না রাখলে তা উৎসব হয় কী-করে? মহামারীর দু-দুটো ওয়েভ কাটিয়ে ত্রাস যখন গেড়ে বসেছে মগজের জমি, অলিখিত নিয়ম হয়ে গেছে দু-ফুটের দূরত্ব, তখন স্যানিটাইজড সংক্ষিপ্ততায় সুবর্ণ জয়ন্তী পালনে তিল পরিমাণ অসুবিধাও হত না হয়তো। কিন্তু এই মারীর সময়েও আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষ, সুবর্ণ জয়ন্তী আয়োজক কমিটি আয়োজন করেছেন এমন এক মহোৎসবের যা-কি-না শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক নির্বিশেষে তার আশেপাশের গ্রামবাসী অজস্র মানুষকে উদ্যাপনের অবকাশ তৈরি করে দিয়েছে!

এই আনন্দযজ্ঞ থেমে যাবে তার আরও বৃহৎ কর্তব্যের খাতিরে। সুবর্ণ জয়ন্তীর রোশনাই পিছনে ফেলে আবারও ঘড়ি ধরে প্রতিদিন বাজবে ক্লাসের ঘণ্টা। বেঞ্চে শুয়ে থাকা ব্যাগগুলোয় জমা হবে কত-না গল্প, বোর্ডের সামনের সারি সারি মুখগুলো পালটে পালটে যাবে। শিক্ষকরাও কেউ কেউ অবসর নেবেন, নতুন শিক্ষক আসবেন। কালের নিয়মে রূপ, রং, আকার, অবয়ব, সবেরই পরিবর্তন হবে। তবে আমার কলেজ চিরকাল অনুভবের এই গভীরতা, ভাবনার এহেন উদারতা, মমত্বের এমনই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বোধ পরম্পরায় বহন ও বিনিময় করে চলবে, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস! তাই রোল কলের খাতা থেকে নাম কাটা গেলেও 'কলেজের প্রাক্তনী' এই পরিচয় আর যে-খুশি মেনে নিক, আমি মেনে নিতে রাজি নই, কোনোমতেই। আশা করি দোষ-ত্রুটি নিজগুণে মার্জনা করবেন। ধন্যবাদ।

পারভিন হোসেন
প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ, (২০১৭-২০২০)

‘স্মৃতি’?— *অপরাজিতা* প্রসঙ্গে

যারা শীতের রোদের মতো স্মৃতি মেখে (কাতর নয় বোধহয়) বাঁচতে ভালোবাসে, আমিও সেই অত্যন্ত পরিচিত দলেরই একজন। কিন্তু স্মৃতির কিছু দায়ও থাকে। কিংবা, ভালো শোনায় বললে—প্রবণতা থাকে। প্রবণতা থাকে রয়ে যাওয়ার। সময় যতই রণপায়ে ছুটুক-না-কেন, স্মৃতিরা তারও পিছু ধরতে চায়। এক সময়ে গল্প হয়ে ওঠে।

স্মৃতি এবং গল্প প্রসঙ্গ শুরুতেই বলতে হল, কারণ সময়ে কলেজ গল্পই হয়ে ওঠে। এবং আমার জীবনের এই ‘কলেজ’ গল্পে কলেজের প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশতম বছর একটা বড়ো অংশ। যা স্মৃতির, যা উদ্‌যাপনের, এমনকি কালকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উদ্‌যাপন-শেষেও উদ্‌যাপনের এবং যা অবশ্যই গল্প, গল্পের অ-চরিত্রদের তা ভালো লাগবে, সেই সুখ-আশাতেই লিখে ফেলতে পারি না। প্রকাশের প্রথম বিচারক, দর্শক, পাঠক, শ্রোতা— যদি নিজেই, প্রাথমিক, এবং তা বাদে যদি অন্য কোনো কারণ না-ই প্রতিষ্ঠা করি, তবে কেন? যদি প্রকাশ হয় লেখা, তবে এ প্রশ্নেরও দায় শব্দকারের। এবং উত্তর পাই; স্মৃতির দায়, গল্পের দায়, এবং বোধহয় সময়ের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, তারও দায়। তবে, যা গল্প, তার গল্প বলতে ভালো লাগবে না। এতবার স্মৃতি এবং গল্পের কথা বলার পর মনে হচ্ছে, গল্পের গল্প বলব না বলেও হয়তো অচেতনে সাজিয়ে রেখেছি ঘটনারই কোনো বিবরণ, এবং তাইই হয়তো বারবার বাক্যকে বেঁধে ফেলছি ফেলে আসা সময়-বন্ধনীর মধ্যে।

আমাদের কলেজে, আমাদের সময় উদ্‌যাপনের একটা গল্প অপরাজিতা। ‘সুবর্ণ জয়ন্তী’-র অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা। কিন্তু কেন অপরাজিতা...

আজকাল (মূলত) সোশ্যাল মিডিয়ার সহজলভ্যতায় নারীবাদ/ ফেমিনিজম কথাটা বেশ জনপ্রিয়। নারীবাদের সংজ্ঞা বিতর্কের বিষয়। এবং এই কথাটার মধ্যে দিয়ে এটাও বলা হল, নারীবাদের একটা ধারণা সবারই থাকে, বিশেষত মেয়েদের। নীতিগত, আদর্শগত, অভিজ্ঞতাভিত্তিক তাদের ধারণার নানান প্রশ্ন এবং তার নানান যুক্তি। তাও বিতর্কের। যদিও প্রতিষ্ঠা করার কোনো জেদ নেই সব যুক্তিই অকাট্য। কিন্তু, মতামত, বিশ্লেষণ— সমস্ত কিছুরই উৎস হয়তো দেখা যাবে কোনো অভিজ্ঞতা। মেয়েরা, বিশেষত গ্রামের মেয়েরা, যেখানে আমার বড়ো হওয়া, যেখানে আমার কলেজ— দুঃখজনক, কিন্তু সেখানে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার চোখের বড়ো অভাব। প্রশ্ন এবং তার যুক্তি বহু দূরের। বিতর্ক সেখানে সমস্যার অস্তিত্ব নিয়ে, যেহেতু নিয়ন্ত্রণ পিতৃতান্ত্রিকতার। এখানে বাদাবাদির ধারণা নিয়ে নানা মতের কোনটা সঠিক, সেই বিতর্কের আগে মতগুলোই তৈরি হওয়া প্রয়োজনীয়।

অপরাজিতার শব্দচয়ন, গল্পচয়ন আমার। ভাবনা, সাহস, উদ্যম আমাদের। যে স্থান, যে অধিকারিত্ব প্রশ্রয় দেয় না তার দিকে ওঠা কোনো একক শব্দকেও, রেয়াত করে না কোনো প্রশ্নের, সুবর্ণ জয়ন্তীর মঞ্চ, যার সামনে হাজির অনেক অনেক চোখ রাঙানি, যারা উপেক্ষা দেখাতে চায়, গুরুত্বহীন করে দেখাতে চায় এবং আসলে ভয় পায় তার দিকে ওঠা প্রশ্নকে, সেই সব চোখরাঙানিকে উপেক্ষা করে নয়, সেই সব চোখের দিকে চোখ রেখে আসলে নিজেদের কথা বলার সাহস জোগানো আমাদের, আমাদেরই সেই প্রকাশ, মঞ্চে দাঁড়িয়ে এবং মঞ্চের আড়ালে দাঁড়িয়ে— প্রত্যেকেরই।

অপরাজিতা, যা আমাদের প্রশ্ন, যা আমাদের সাহসী প্রকাশ, স্ক্রিপ্টটা লেখা হয়েছিল (হয়তো) খুব চেনা কয়েকটা সমস্যা নিয়ে। জন্মের আগে থেকেই মেয়েজীবনে পিতৃতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ কীভাবে গলা চেপে ধরতে পারে, তার কয়েকটা গল্প দিয়ে স্ক্রিপ্টটা। কীভাবে পিতৃতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণও করে বেশিরভাগ মেয়েরা এবং তার শিকারও বেশিরভাগ মেয়েরাই, *অপরাজিতা* সেই গল্পও বলে। *অপরাজিতা* যে মেয়েদের তৈরি ছিল, আশ্চর্যজনকভাবে তাদের প্রত্যেকেরই চোখ ছিল, যুক্তি ছিল, প্রশ্ন ছিল, যা তারা পারফর্ম করছিল সেই বিষয়ে।

যেহেতু *অপরাজিতা* আমাদের গল্পও, আমাদের নৈতিকতা-যুক্তি ছাড়াও আমাদের আরও অনেক কিছু ছিল। উদ্যম-অনুদ্যম, পারস্পরিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং তার অভাব, শেষ মুহূর্তে স্ক্রিপ্ট বদলে বা বেড়ে যাওয়া, নতুন বন্ধু যুক্ত হওয়া— আরও অনেক গল্পের মতো আমাদেরও সেসব। বন্ধুতা মেলে তো বটেই, কিন্তু খুব ব্যক্তিগতভাবে যে অভিজ্ঞতা স্মৃতি/ গল্পে বিশেষ, বিশ্বাসী হয়ে ওঠার গল্প। পরস্পরের প্রতি, এবং ভীষণভাবে নিজের প্রতি।

খানিক আগেই যে পরিবেশ সম্বন্ধে লিখলাম সমালোচনামূলক কথা, সেই পরিবেশই যেন আয়োজন করল আমাদের গল্পের। বা, আমরা সেই পরিবেশেই প্রকাশ করলাম, প্রতিষ্ঠা করলাম আমাদের কথা।

শ্রেয়া প্রামাণিক
প্রাক্তনী, বাংলা বিভাগ, (২০২১-২০২৪)

সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন মহোৎসব
রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়
চাঁপাডাঙা, হুগলি

অনুষ্ঠানসূচি

৮ নভেম্বর, ২০২২

সময়	অনুষ্ঠানের বিবরণ	স্থান
সকাল ৯.৩০	পদযাত্রা	চাঁপাডাঙা অঞ্চল
১২ টা	প্যারেড	কলেজ মাঠ
১২টা ১৫	পতাকা উত্তোলন	ঐ
১২টা ২৫	প্রদীপ প্রজ্জ্বলন	মূলমঞ্চ
১২টা ৩৫	উদ্বোধনী সংগীত	মূলমঞ্চ
১২টা ৪০	অতিথি বরণ	মূলমঞ্চ
১টা	অতিথিদের বক্তৃতা	মূলমঞ্চ
২টো	বইমেলা, প্রদর্শনী, মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন	বোটানি,২,৩,৪ এবং ৬ নম্বর ঘর
৩টে ৪৫	সমবেত সংগীত - "তুম হি হো মাতা"	মূলমঞ্চ
৪টে	একক কবিতা - "বাংলাটা ঠিক আসে না"/ ভবানীপ্রসাদ মজুমদার	মূলমঞ্চ
৪টে ১০	সমবেত লোকনৃত্য - "মনে করি আসাম যাব"	মূলমঞ্চ
৪টে ২০	একক নৃত্য - "টাইটানিক"	মূলমঞ্চ
৪টে ২৫	একক কবিতা - "সার্থক জনম আমার"/ শুভ দাশগুপ্ত	মূলমঞ্চ
৪টে ৩০	একক নৃত্য - "পিঙ্গা"	মূলমঞ্চ
৪টে ৩৫	একক সংগীত	মূলমঞ্চ
৪টে ৫৫	দ্বৈত লোকনৃত্য - "কালো জলে কুচলা তলে"	মূলমঞ্চ
৫টা	একক নৃত্য - "ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়"	মূলমঞ্চ
৫টা ৫	একক নৃত্য "জিগিজা পিজাং"	মূলমঞ্চ
৫টা ১০	নৃত্যনাট্য "ভানুসিংহের পদাবলী "	মূলমঞ্চ
৬টা	বাউল দলগত গান	মূলমঞ্চ

সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন মহোৎসব
রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়
চাঁপাডাঙা, হুগলি

অনুষ্ঠানসূচি

৯ নভেম্বর, ২০২২

সময়	অনুষ্ঠানের বিবরণ	স্থান
১১টা	অঙ্কন প্রতিযোগিতা - 'ক' বিভাগ	নিউ বিল্ডিং
১২টা	অঙ্কন প্রতিযোগিতা - 'খ' এবং 'গ' বিভাগ	ঐ
১১টা	আবৃত্তি প্রতিযোগিতা	৭৩ ও ৭৪ নম্বর ঘর
১১টা	কুইজ প্রতিযোগিতা	৪৮ নম্বর ঘর
১টা	সংগীত প্রতিযোগিতা	৭৩ ও ৭৪ নম্বর ঘর
২টো	বিতর্ক প্রতিযোগিতা	৪৮ নম্বর ঘর
১২টা	রক্তদান শিবির	বোটানি
১২টা	বাউল গান	মূল মঞ্চ
১২টা ১০	একক নৃত্য	মূল মঞ্চ
১২টা ২০	দ্বৈত সংগীত - "এ কী হল" + "আমার যা কিছু কথা"	মূল মঞ্চ
১২টা ৩০	একক নৃত্য - "মেরে ঢোলনা"	মূল মঞ্চ
১২টা ৩৫	একক কবিতা - "রাধিকা সংবাদ"	মূল মঞ্চ
১২টা ৪৫	একক নৃত্য - "বরসো রে মেঘা মেঘা"	মূল মঞ্চ
১টা	একক সংগীত - কীর্তন	মূল মঞ্চ
২টো	একক কবিতা - "সংসার"	মূল মঞ্চ
২টো ৫	সমবেত লোকনৃত্য - "ফাগুনের মোহনায়"	মূল মঞ্চ
২টো ১৫	একক সংগীত - "তোমরা যা বলো তাই বলো" ও "তার অন্ত নাই গো নাই"	মূল মঞ্চ
২ট ৩০	একক সংগীত - "যেতে দাও আমায়" এবং "রূপ সাগরে মনের মানুষ"	মূল মঞ্চ
২টো ৪৫	কবিতা পাঠ - "তোমার দুর্গা আমার দুর্গা"	মূল মঞ্চ
৩টে	একক সংগীত - কৃষ্ণকালী শংকর সাউ	মূল মঞ্চ
৩টে ৩০	নৃত্যনাট্য - অভিসার	মূল মঞ্চ
৩টে ৫০	একক কবিতা পাঠ - "সুচেতনা"	মূল মঞ্চ
৪টে	নাটক - "অপরাজিতা"	মূল মঞ্চ
৪টে ৪৫	পুরস্কার বিতরণী	মূল মঞ্চ
৫টা ৪৫	সমবেত সংগীত	মূল মঞ্চ
৬টা	একক নৃত্য - "আজ ফাগুনে পলাশ শিমুল"	মূল মঞ্চ
৬টা ১০	একক নৃত্য - "আমরা সবাই রাজা"	মূল মঞ্চ
৬টা ২০	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান - স্পেনিয়া	মূল মঞ্চ
৭টা ২০	নাটক - "কাটা"	মূল মঞ্চ

সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন মহোৎসব

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

চাঁপাডাঙা, হুগলি

অনুষ্ঠানসূচি

১০ নভেম্বর, ২০২২

সময়	অনুষ্ঠানের বিষয়	স্থান
১১টা ৩০	চক্ষুপরীক্ষা শিবির	বোটানি
১২টা	উদ্বোধন - লিটল ম্যাগাজিন প্রদর্শনীর উদ্বোধন	৪৮ নম্বর ঘর
১২টা ০৫	অধ্যক্ষের বক্তব্য	৪৮ নম্বর ঘর
১২টা ১৫	উদ্বোধকের বক্তব্য -	৪৮ নম্বর ঘর
১২টা ৪৫	আলোচনা সভা	
১২টা ৩০	উদ্বোধন - বিজ্ঞান প্রদর্শনী	৬ নম্বর ঘর
১২টা ৩০	বিদ্যালয় স্তরের বিজ্ঞান প্রতিযোগিতা	একতলার কোরিডোর
২টো ৩০	একক নৃত্য - "সরস্বতী বন্দনা / কোয়েল গুহাইত	মূলমঞ্চ
২টো ৪০	একক সংগীত / শংকর দাস	মূলমঞ্চ
৩টে	একক নৃত্য / সম্প্রীতি জানা	মূলমঞ্চ
৩টে ১৫	একক নৃত্য / সম্পূর্ণা কোলে	মূলমঞ্চ
৪টে	একক সংগীত / উদয় খান	মূলমঞ্চ
৪টে ২০	একক নৃত্য - "পিন্তারে পলাশের বন" + "ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়"	মূলমঞ্চ
৪টে ৩০	নাটক - "নরক গুলজার"	মূলমঞ্চ
৫টা ৩০	একক নৃত্য - কত্থক	মূলমঞ্চ
৬টা ১৫	দ্বৈত সংগীত / সোমা নন্দী ও কৃষ্ণকালী শংকর সাউ	মূলমঞ্চ

সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন মহোৎসব

রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়

চাঁপাডাঙা, হুগলি

অনুষ্ঠানসূচি

১১ নভেম্বর, ২০২২

সময়	অনুষ্ঠানের বিষয়	স্থান
১২টা	উদ্বোধন - চক্ষুপরীক্ষা শিবির	বোটানি
১২টা ৩০	আলোচনা সভা - সম্পাদনার সাম্প্রতিক	৪৮
২টো	একক নৃত্য / সঙ্গিতা সামন্ত	মূলমঞ্চ
২টো ১০	একক কবিতা পাঠ - "উদ্বোধন"	মূলমঞ্চ
২টো ২০	দ্বৈত নৃত্য - "ডোলা রে ডোলা রে"	মূলমঞ্চ
২টো ৩০	একক কবিতা পাঠ - "ইতি অপু" / পৃথ্বীরাজ চৌধুরী	মূলমঞ্চ
২টো ৪০	বাউল গান / মোহন দলুই ও সম্প্রদায়	মূলমঞ্চ
৩টে ৪৫	একক কবিতা পাঠ - "রাস্তা কারো একার নয়	মূলমঞ্চ
৩টে ৫০	দ্বৈত নৃত্য - "শিব বন্দনা"	মূলমঞ্চ
৪টে	নৃত্যনাট্য - "ভালোবাসায় উদ্বেলতা"	মূলমঞ্চ
৪টে ৪০	সমবেত নৃত্য - "শাল তলে বেলা ডুবিল"	মূলমঞ্চ
৪টে ৪৫	সমবেত নৃত্য	মূলমঞ্চ
৫টা	ক্যারাটে প্রদর্শনী	মূলমঞ্চ
৬টা	একক নৃত্য - "দেখো আলোয় আলো আকাশ"	মূলমঞ্চ
৬টা ১০	একক সংগীত / সোমা নন্দী	মূলমঞ্চ
৬টা ৩০	একক কবিতা পাঠ - "আমি সেই মেয়ে" / শুভ দাশগুপ্ত	মূলমঞ্চ
৬টা ৪০	নাটক - "ট্যাক্সি সাফ"	মূলমঞ্চ

With best compliments:

National Electric

SHIVAM PAINTS

"Where Quality Meets Creativity"

We are Authorized dealer of ASIAN PAINTS, BERGER PAINTS , DULUX PAINTS

Address-Subhasgram,
Kol-700147
PH-8509044778/
7063452518

Prop- DEBASIS PALUI, B-TECH CIVIL ENGINEERING

PAINTING /PUTTY/ PEST CONTROL/ DAMP CONTROL WORK

DONE AT -

1. BUILDING (INSIDE & OUTSIDE) ,
2. CO-OPERATIVE HOUSING COMPLEX
3. HIGH-RISE BUILDING

OUR WORK PROCEDURE-

- Scraping by brush and remove all moss ,Blister
- Wash by clean water with High pressure jet
- Repair wall crack by SIKA CRACK SEAL
- Use SIKA LATEX waterproofing chemical for damp
- Priming work
- Weather coat

OUR CLIENT-

MALDA SUPERSPECIALITY HOSPITAL (G+5)

SMARANIKA HOUSING CO-OPERATIVE (G+8)

BIRATI COLLEGE(G+2)

HIRALAL COLLEGE(G+2)

SMC COLLEGE (G+2)

PUBLIC WORKS DEPT

With best compliments

Biswanath Adhikari

RAMKRISHNA LAB SUPPLIER

VILL.-Makrar , P.O. - Ramnarayanpur, P.S.- Tarakeswar , Dist.- Hooghly , Pin.- 712401

e-mail : ramkrishna.lab@gmail.com, Cell No .: 9332389453 / 9609373248

DEALS ON

PHYSICS, CHEMISTRY, BOTANY, ZOOLOGY, COMPUTER SCIENCE & GEOGRAPHY INSTRUMENT & CHEMICAL'S REAGENT FOR SCHOOL, COLLEGE, ENGINERING COLLEGE, UNIVERSITY & FISHERY DEPARTMENT, ETC.

WE ARE AUTHORISED & STOKIST

"INCO", "OSAW", "OXFORD", "R & COMPANY", "DEVCO", "REVCO", "PISCO", "SES", "DOT-TECH", "SAFFRON", "EQUIPTRONICS", "SYSTRONICS", "GOKO" & OUR "R K LAB" BRAND

REGISTERED OFFICE: VILL –MAKRAR, P.O – RAMNARAYANPUR, P.S.- TARAKESWAR, DIST- HOOGHLY, PIN- 712401, W.B

OFFICE: T.P.C.C.COLD STORAGE OFFICE BUILDING 1ST FLOOR, CINEMATOLA, CHAMPADANGA, TARAKESWAR, HOOGHLY, 712401, W.B

PH- 9609373248/9332389453

Email : ramkrishna.lab@gmail.com

Website : www.rklab.in / www.rklab.info

Youtube: https://www.youtube.com/c/RamkrishnaLabSupplier

facebook : https://www.facebook.com/rklabsupplier/

Berger

GOLD CARD 38 YEARS

Gold Card Club

THE MANAGING DIRECTOR, BERGER PAINTS INDIA LIMITED
IS HONOURED TO WELCOME

Chandimata Colour Point

TO THE BERGER PAINTS
GOLD CARD CLUB 2022 - 2023

Abhijit Roy

ABHIJIT ROY

MULTILINE SCIENTIFIC

Importer and Exporter of Laboratory Equipments & Chemicals

Email: multilinescientific@gmail.com

9830450205

Address: 3A, K.C. Lane, Kolkata- 700036

(Ai) চন্দ্র বাসনালয় TM

TAJ

PRESSURE COOKER

অনুমোদিত ডিলার

সমস্ত রকম বাসনের পাইকারী প্রতিষ্ঠান

প্রো:- শিবনাথ চন্দ্র

ফোন নং- (০৩২১২) ২৫৬-৩৭৬ (দোকান)/ মো:-৯৭৩২৭০২৬১৩

চাঁপাডাঙ্গা তেঁতুলতলা, কলেজ রোড, হুগলী

সোমবার অর্দ্ধদিবস ও মঙ্গলবার পূর্ণদিবস বন্ধ

The space is donated by:

Jhantu Furniture

ফুড – মহল

রেষ্টুরেন্ট এণ্ড হোটেল

চাঁপাডাঙ্গা, সুপার মার্কেট
(মেন গেটের বিপরিতে)

যোগাযোগ: 9593534077 / 7076011980

সুসজ্জিত রেষ্টুরেন্ট-এ আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাই। উন্নত মানের সুস্বাদু বিরিয়ানি, চাইনিজ, ইন্ডিয়ান, তন্দুর, মোমো, এগরোল ইত্যাদি-র আয়োজনে আমরা আপনাদের সেবায় তৈরী। প্রতিদিন দুপুরে "নিরামিষ ও আমিষ থালি"-র জন্য আপনারা "ফুড মহল"-এ আসুন। আপনাদের অর্ডার অনুযায়ী সমস্ত খাবার হোমডেলিভারী-র সুব্যবস্থা আছে। আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাদের সাথে আছি।

The space is donated by:

Sudhir Poddar

AVIOR TECHNOLOGIES
PVT. LTD.

We Help
Your
LIBRARY
To Grow Faster

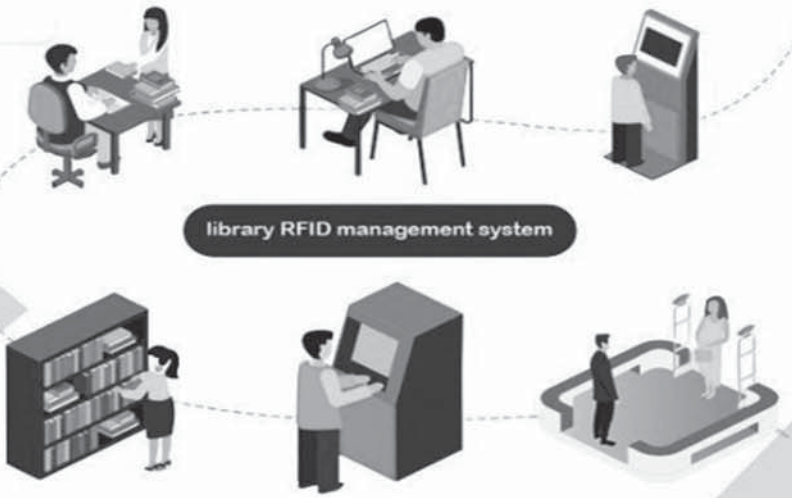

koha

DSPACE

RFID

Sreebhumi, Kolkata-48
Call-8017616701/7044031771-72
www.aviortechnologies.co.in

The space is donated by:

Sanjib Sarkar

মো:-৯৪৩৪৫৬৬৮৫২/৭৮৭২৭৫৪৯২৩

প্রভাবতী স্টোর এণ্ড ডেকরেটার

প্রো:- শ্রী সহদেব দোলুই

চাঁপাডাঙ্গা (সিনেমাতলা) :: হুগলী

The Modern Enterprise

3A, Mango Lane, 1st Floor, Kolkata - 700001 (WB) India

GST: 19ALBPR4800M1ZU

Mobile: +919433609696 (Call/Whatsapp)

The space is donated by:

Raja Furniture

The space is donated by:

Mordern Computer

M: 9732755895

গ্ল্যামার

কসমেটিক্স * ইমিটেশন

প্রোঃ - দীনবন্ধু দাস

চাঁপাডাঙ্গা, রথতলা, হুগলী

With best compliments:

SAHA ENTERPRISES

SOUMITRA DEBNATH

UNIQUE TOURISM

44/B Baghbazar Street
Near Baghbazar Bata,
Kolkata - 700 003
e-mail: uniquetourism@gmail.com

Mobile: 033-2533 9144
Eax: 033-2843 2162
Mobile: 98318 45195

The space is donated by:

Boi-Mahal

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গন্তব্য রেনচেনপঙ - এ আমাদের নিজস্ব হোটেল

REESUM RESORT

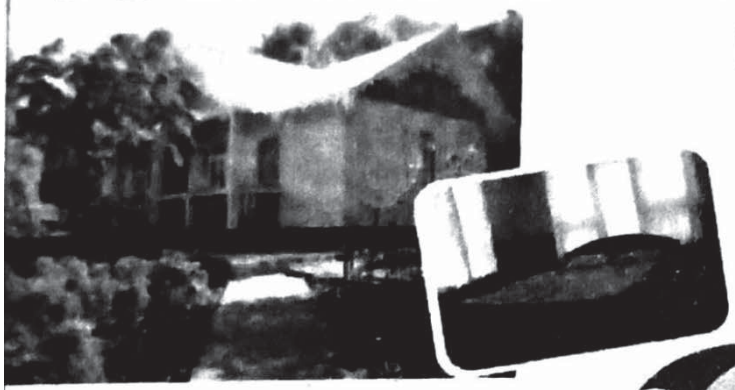

RENCHENPONG WEST SIKKIM

Special Package

রডডেনড্রনের সমারোহে চলুন
পাখির খোঁজে ভার্সে,বোরং,
রিনচেনপঙ, ছায়াতাল

BISHAL HOLIDAYS

Dharmatala Market 9/C, Esplanade Row (East),Beside
K.C.Das, Shop No:24, Kolkata-700069
Ph:**9674990768 / 9831090768 / 9432596964**
www.bishalholidays.com.in
E-mail:bishalholydays2015@gmail.com

E-mail: eurosportskolkata@gmail.com
GSTIN: 19ACBPH4804N1ZH

Euro Sports

Wholesale & Retail
All Kinds of Sports
Goods Seller
Specialist for : **GYM EQUIPMENTS**

B-2 / 15, Dr. B. C. ROY MARKET, (MAIDAN MARKET), KOL - 69 , Mob : 9143083046 / 8240918530

E-mail: asthaenterprisejoyrampur@gmail.com
GSTIN: 19APFPP8028K1ZC

Mob:8240918530
9143083046

ASTHA ENTERPRISE

GOVERNMENT CONTRACTOR & GENERAL ORDER SUPPLIER
Jayrampur, Gangadharpur, Panchla, Howrah, PIN-711302

৭৮৬ মোঃ ৯৫৯৩৫৭৬০০৬

মদিনা ইলেকট্রিক

সমস্ত রকম ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জাম বিক্রয় ও
ফ্যান, মোটর রিপেয়ারিং এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

চাঁপাডাঙ্গা কলেজ রোড হুগলী

JANA FINANCL
SERVICES
YOUR LIFE MAKE SIMI

With best compliments from ..

JANA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD.

INVESTMENT IS AN ART

We Help you Creating Wealth to achieve your Financial Freedom.

EQUITY - MUTUAL FUND - PMS

Call us : 6294365051

www.janafinance.in

help@janafinance.in

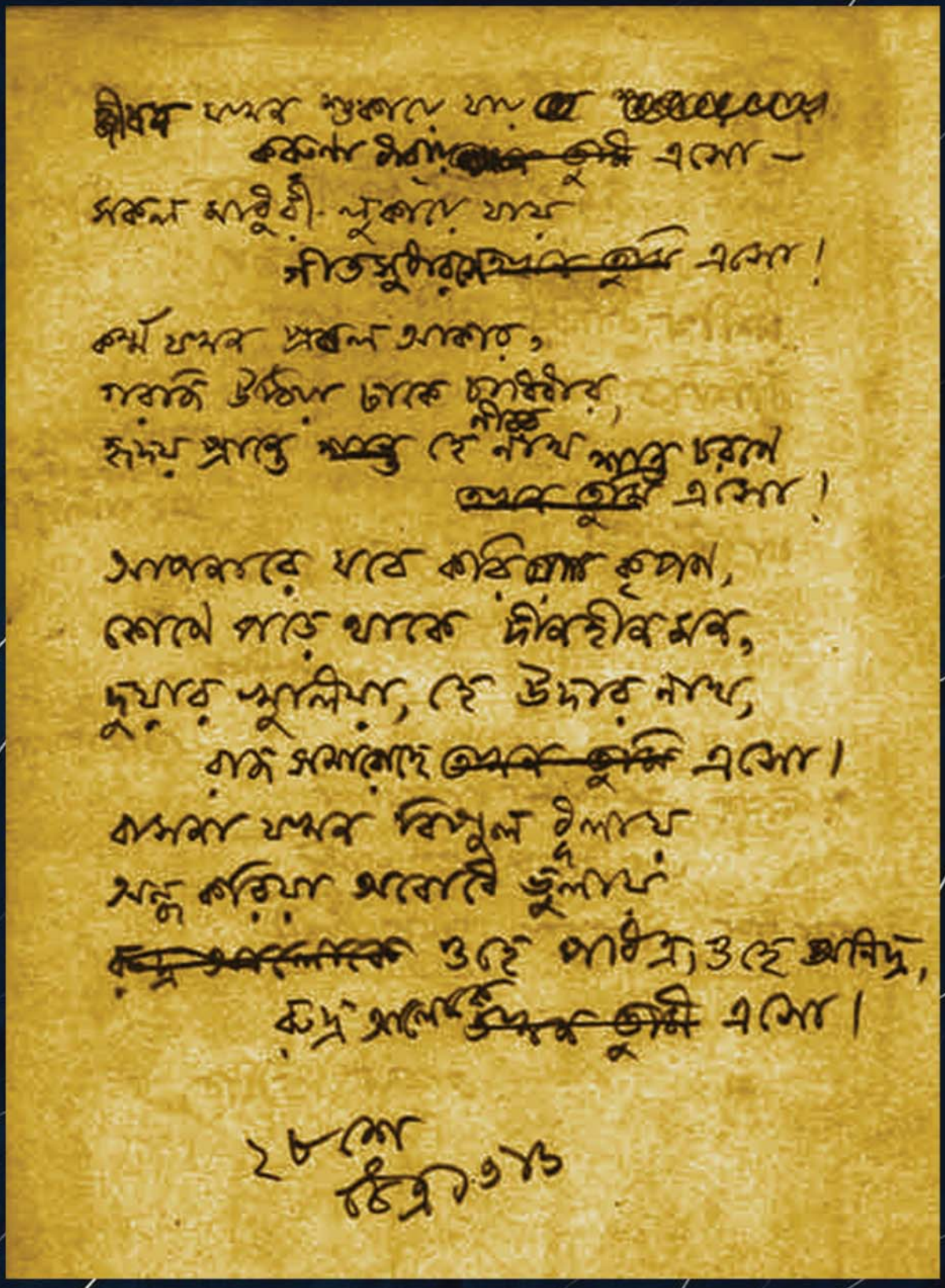

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় ~~তখন তুমি~~ এসো —
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়
গীতসুধারসে ~~তখন তুমি~~ এসো !

কর্ম যখন প্রবল আকার,
গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার,
হৃদয় প্রান্তে ~~শান্ত~~ হে নীরব নাথ শান্ত চরণে
~~তখন তুমি~~ এসো !

আপনারে যবে করিয়া কৃপণ,
কোণে পড়ে থাকে দীনহীন মন,
দুয়ার খুলিয়া, হে উদার নাথ,
রাজসমারোহে ~~তখন তুমি~~ এসো।

বাসনা যখন বিপুল ধূলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
~~রুদ্র আলোকে~~ ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র আলোকে ~~তখন তুমি~~ এসো।

২৮শে
চৈত্র ১৩১৬

www.rabindramahavidyalaya.ac.in

03212-295330

principal.rabindramahavidyala@gmail.com